Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সিক্রেট মিশনস

মোসাদ স্টোরিজ

আবদুল্লাহ ইবনে মাহমুদ

fb id: পিডিএফ বুক ভান্ডার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফেসবুক আইডি: পিডিএফ বুক ভান্ডার

সিক্রেট মিশনস

মোসাদ স্টোরিজ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ

সম্পাদনা
উচ্ছ্বাস তৌসিফ

অন্যধারা

অন্যধারা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লেখকের কথা

অন্যধারার ফারুক ভাই যখন খুব করে ধরলেন একটি বই দিতেই হবে, তখন চিন্তা করছিলাম, কোন বইটি আমি এ প্রকাশনীতে দিতে পারি। দুটো অলিখিত বই মাথায় ঘুরছিল, **"মক্কা-মদিনা-জেরুজালেম"** আর **"মোসাদ স্টোরিজ"**। শেষমেশ ঠিক করলাম, দ্বিতীয়টাই দেব। তবে বইয়ের নাম "মোসাদ স্টোরিজ" দেব না। নাম হবে **'সিক্রেট মিশনস'**, যার এবারকার পর্ব মোসাদকে নিয়ে। মনে ক্ষীণ আশা, হয়তো এটা সিরিজ হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে, আর একেকটি বই হবে একেকটি গোয়েন্দা সংস্থার পরিচয় আর মিশন নিয়ে। হয়তো কোনো কোনো সংস্থা নিয়ে একাধিক বইও হতে পারে! কে জানে?

তবে প্রথম বই হিসেবে মোসাদকে বাছাই করার কোনো বিকল্প নেই। 'মোসাদ' মানেই রহস্যে ঘেরা এক সংস্থা, যাদের মিশনগুলো হয় নির্দয় আর দুর্ধর্ষ। অথচ তাদের ব্যাপারে জানাশোনা খুবই কম। নানা জনের জবানি আর লিক হওয়া খবরাখবর থেকে যতটুকু জানতে পারা যায়, তা থেকেই লিখতে হয় মোসাদকে নিয়ে। ভাগ্য ভালো, মাইকেল বার-জোহারের একটি বই আছে, যাতে দুজন লেখক ঘেঁটে ঘুঁটে ২০১০-২০১১ সাল পর্যন্ত নানা মিশন নিয়ে লিখে রেখেছেন। সেগুলো থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায়, আর ইন্টারনেট ও অন্যান্য কিছু বই আছে। এগুলোর সাহায্য নিয়ে নিজের মতো করে মোসাদের জন্ম থেকে শুরু করে এই নব্য 'রামসাদ' বাছাই পর্যন্ত নানা কাহিনী লিখে ফেললাম।

'রামসাদ' শব্দটা অপরিচিত ঠেকছে? মোসাদের প্রধানকে ডাকা হয় 'রামসাদ'। এরকম টুকটাক অনেক তথ্যই বইটি পড়লে জানা যাবে। এই যেমন ধরুন, এত বড় গোয়েন্দা সংস্থা, অথচ মোসাদের হেডকোয়ার্টার যে আসলে কোথায়, কেউ নিশ্চিত জানে না!

বইতে অনেকগুলো অংশেই মোসাদ প্রতিষ্ঠার কার্যকারণ ব্যখ্যা করতে গিয়ে কিংবা মিশন ডিটেইলস দিতে গিয়ে ইসরাইল অর্থাৎ মোসাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হয়েছে, যেন পাঠক ওদিকের ভাবনা অনুভব করতে পারেন। একটা ঘটনাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে, কর্মসম্পাদকের দৃষ্টিতে দেখাটা জরুরি বলেই মনে হয়েছে আমার কাছে। আর বিভিন্ন চরিত্র আর স্থান কল্পনা করতে যেন সুবিধা হয়, সেজন্য বইটিতে বেশ কিছু ছবি যোগ করা হয়েছে।

বইটি পড়ে পাঠক নতুন কিছু জানবেন, এটাই প্রত্যাশা।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ

ঢাকা

মার্চ ২০২১

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্পাদকের কথা

মোসাদ। পৃথিবীর অন্যতম রহস্যময় গুপ্তচর সংগঠন। যাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে জানা যায় না তেমন কিছুই। বিভিন্ন মানুষের বয়ানে মাঝে-সাঝে হয়তোবা শোনা যায়। কখনোবা কালেভদ্রে ফাঁস হয়ে যায় নির্মম কোনো ঘটনার পেছনে মোসাদের কলকাঠি নাড়ার কথা। কিন্তু এর পরিমাণ নিতান্তই অল্প।

মানুষ অজানাকে এমনিতেই ভয় পায়। তার ওপর মোসাদকে নিয়ে টুকটাক যা জানা গেছে, তার পরতে পরতে প্রচণ্ড নির্মমতা। দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর সব চরিত্র বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে একের পর ভয়ংকর হামলা করছে। ঢুকে যাচ্ছে সরকারের ওপর মহলের রন্ধ্রের ভেতর। অনেকদিন পর কিংবদন্তীর মতো করে জানা যায় এসব গল্প। চাঁদের হালকা আলো যেমন রাতের অন্ধকারের রহস্যময়তা আরও বাড়িয়ে দেয়, ভয় ধরিয়ে দেয় মানুষের বুকে, মোসাদকে নিয়ে এসব গল্পও একই ভূমিকা রেখে চলেছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ তার **সিক্রেট মিশনসঃ মোসাদ স্টোরিজ** বইতে এই রহস্যময়তার পর্দা যথাসম্ভব মেলে ধরতে চেয়েছেন। মোসাদ প্রতিষ্ঠা, এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু চরিত্র, বিভিন্ন দেশে তাদের অপারেশন ইত্যাদি উঠে এসেছে তার লেখায়। মোট ছয়টি অধ্যায় আছে বইতে। সাথে আছে ঘটনার সঙ্গে জড়িত স্থান-কাল-পাত্রের ছবি।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদের লেখা বেশ স্বাদু। পড়তে আরাম। ক্লান্তি আসে না। এই বইটি বেশ তথ্যবহুল। কিন্তু পড়ার সময় লেখক জোর করে তথ্য গেলাতে চাইছেন বলে মনে হবে না একদমই। বই সম্পাদনা করা বেশ পরিশ্রমের কাজ। কিন্তু এই বই সম্পাদনা করতে গিয়ে একবারও ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ হয়নি।

ইতিহাস, গুপ্তচর সংঘ বা মোসাদকে নিয়ে যাদের আগ্রহ আছে, কিংবা নন-ফিকশন পড়তে যাদের ভাল লাগে, এই বই যে তাদের ভাল লাগবে, তা বলা বাহুল্য। যারা ফিকশনের পাঠক, আমার ধারণা এই বইটি পড়লে তারাও ইতিহাস ও নন-ফিকশন পড়ার আনন্দ অনুভব করতে পারবেন।

মোসাদ স্টোরিজ বইটি পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে, এমনটাই আমার প্রত্যাশা। সেই সঙ্গে আশা রাখি, **সিক্রেট মিশনস** সিরিজের আরও পর্ব আসবে। সেসব বইতে উঠে আসবে অন্যান্য গুপ্তচর সংস্থার রোমহর্ষক সব গল্প।

সেসব গল্পের অপেক্ষায়।

উচ্ছ্বাস তৌসিফ
মিরপুর, ঢাকা
মার্চ ২০২১

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচীপত্র

অধ্যায়-১: যখন ছিল না ইসরাইল ১৩
অধ্যায়-২: এক নজরে মোসাদ ৩১
অধ্যায়-৩: একজন ছায়ামানব: মোসাদের পুনরুত্থান ৪০
অধ্যায়-৪: তেহরানে তাণ্ডব ৫৪
অধ্যায়-৫: দুবাইয়ে চিরবিদায় ৭২
অধ্যায়-৬: দামেস্কের গুপ্তচর ৯২
পরিশিষ্ট ১২৫

fb id: পিডিএফ বুক ভান্ডার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধ্যায়-১

যখন ছিল না ইসরাইল

প্রকাণ্ড শব্দে কেঁপে উঠলো জেরুজালেম। বিস্ফোরণের ধাক্কায় কিং ডেভিড হোটেলের একটি পাশ পুরোই উড়ে গেল, আক্ষরিক অর্থেই! পাশের ব্যস্ত রাস্তায় ছিটকে পড়লো বিখ্যাত হোটেলটির ধ্বংসাবশেষ। কান্নার রোল আর মরণ চিৎকারে ভারী হয়ে উঠলো আশপাশ। ৯১ জন মারা যান সেদিন।

বলছিলাম ১৯৪৬ সালের ২২ জুলাই ভরদুপুরে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী আক্রমণের কথা। সেই মারা যাওয়া ৯১ জন ছিলেন নানা দেশের মানুষ, কারণ সে হোটেলে থাকতেন অনেক বিদেশী। এতজন মারা যাওয়ার পাশাপাশি মর্মান্তিকভাবে আহত হন ৪৬ জন।

আজকের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আর তাৎক্ষনিক খবরের দুনিয়ায় যদি এমন ঘটনা ঘটত, যে কাউকে অনুমানের সুযোগ দিলে বেশিরভাগ লোকই সম্ভাব্য নাশকতাকারী হিসেবে আন্দাজ করে বসতো কোনো না কোনো মুসলিম নামধারী গ্রুপের কথা।

আন্দাজ করতে পারেন, কিং ডেভিড হোটেলে আক্রমণকারী সন্ত্রাসী দলটির নাম কী ছিল?

ধ্বংসপ্রাপ্ত কিং ডেভিড হোটেল

fb id: পিডিএফ বুক ভান্ডার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা মোটেও মুসলিম নামধারী ছিল না। বরং তারা ছিল ইহুদি জায়োনিস্ট আন্ডারগ্রাউন্ড সংঘ 'ইরগুন'। পুরো নাম 'ইরগুন জাই লিউমি' (এরেৎস ইসরায়েল) (ארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל), হিব্রু থেকে বাংলা করলে যার মানে দাঁড়ায় 'জাতীয় মিলিটারি সংঘ' (ইসরাইল ভূমিতে)। আদতে বিপ্লবী নাম হলেও, কাজ ছিল তাদের সন্ত্রাসই। এই জায়োনিস্ট 'আধাসামরিক' বাহিনী প্রতাপের সাথে কার্যক্রম চালিয়ে যায় ১৯৩১ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। এ বইতে পরবর্তীতে এ দলের নাম এলে 'ইরগুন' নামেই ডাকা হবে। 'এৎজেল' (אצ"ל) নামেও দলটি পরিচিত ছিল, ইরগুনের পুরো হিব্রু নামের আদ্যক্ষরগুলো থেকে এ নামের উৎপত্তি।

এরকম জঘন্য একটি কাজের প্রতিফল কি ইরগুন পেয়েছিল? কেউ কি তাদের আইনের আওতায় আনে? একদমই না, বরং ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর ইরগুনের নেতা মেনাখিম বেগিন দেশটির প্রধানমন্ত্রী পদ পেয়েছিলেন!

মেনাখিম বেগিন, ইসরাইলের ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখন কথা হলো, এত জায়গা থাকতে তারা জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ কেন চালালো?

সে কাহিনী বুঝতে হলে ফিরে যেতে হবে আরেকটু পেছনে, যখন ছিল না ইসরাইল। আর এর মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারব, ঠিক কী পরিস্থিতিতে জন্ম নেয় পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৮ সালে, আর তাতে হেরে যায় কেন্দ্রীয় শক্তি (অক্ষশক্তি) বা সেন্ট্রাল পাওয়ার্স। এই বিজিত কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে ছিল জার্মান সাম্রাজ্য, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, মুসলিম অটোম্যান সাম্রাজ্য (উসমানি সাম্রাজ্য) আর বুলগেরিয়া। যুদ্ধে জিতে যায় মিত্রশক্তি (অ্যালাইড)। আদতে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর অস্ত্রবিরতি হলেও, কাগজে কলমে যুদ্ধের ইতি হয় ১৯১৯ সালের ২৮ জুন। সেদিন প্যারিস থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদ ভের্সাই প্রাসাদে সাক্ষরিত হয় ভের্সাই চুক্তি, যেখানে জার্মানি আর মিত্রশক্তির যুদ্ধের ইতি টানা হয়। ঠিক পাঁচ বছর আগে এক অস্ট্রিয়ান আর্চডিউকের গুপ্তহত্যার কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

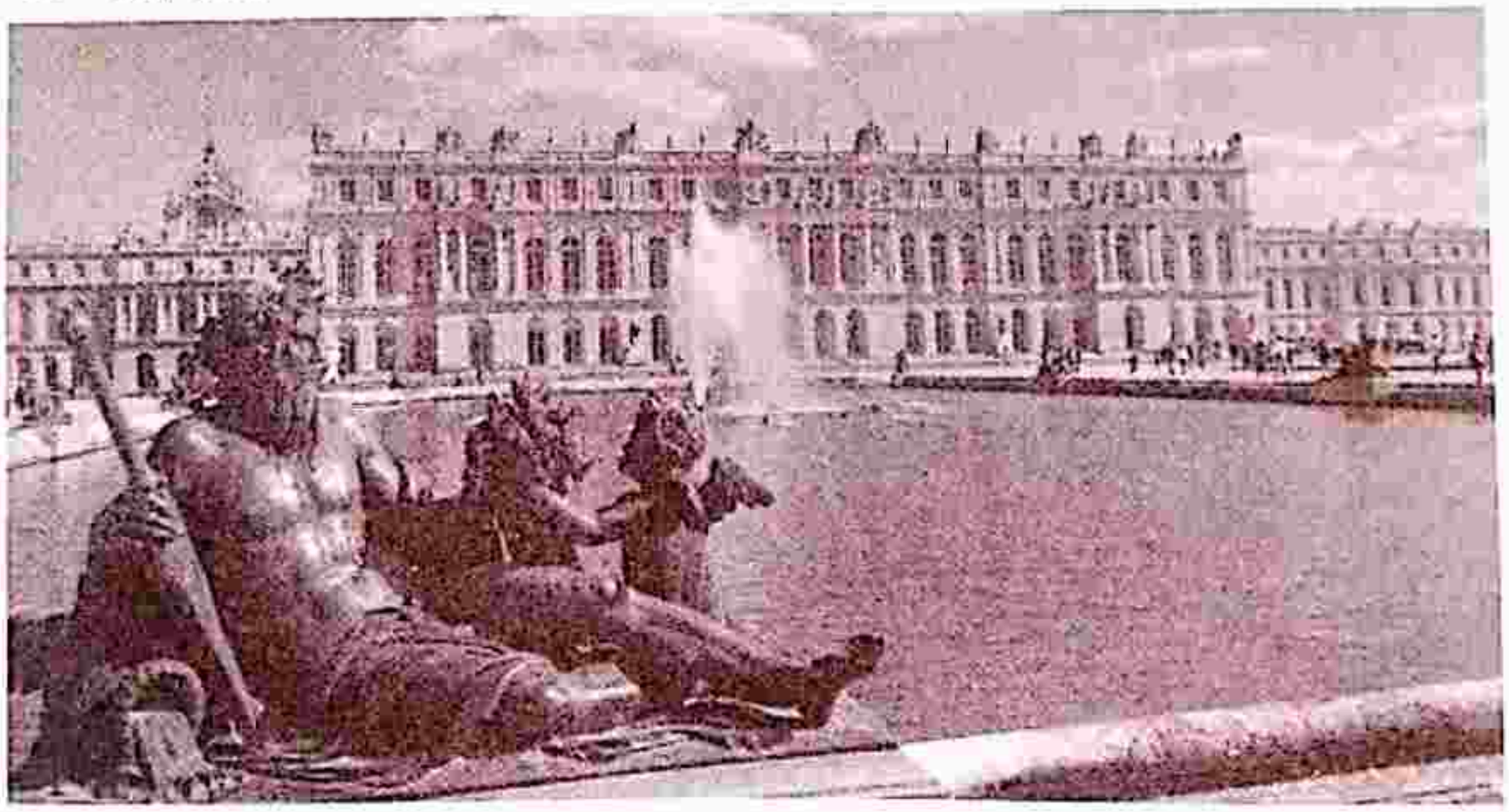

এই সেই ভের্সাই প্রাসাদ, যেখানে স্বাক্ষরিত হয় ভের্সাই চুক্তি

বিশ্বযুদ্ধের পরপর মিত্রশক্তি ১৯১৯ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে একটি সম্মেলন আয়োজন করে, একে 'প্যারিস পিস কনফারেন্স' বা 'প্যারিস শান্তি সম্মেলন' বলা হয় (যার ফল ছিল এ ভের্সাই চুক্তি)। সেখানে যোগদান করেন ৩২টিরও বেশি দেশ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকে আসা কূটনীতিকগণ। এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল, এই যুদ্ধে হেরে গেল যে দেশগুলো, তাদের সাথে কী করা যায়, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া। পরাজিত কেন্দ্রীয় শক্তির দেশগুলোর জন্য বিভিন্ন শর্ত তৈরি করা হয় এ সম্মেলনে। পুরো যুদ্ধের জন্য দায়ী করা হয় জার্মানিকে। দেশটিকে যুদ্ধের কারণে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার বহনের জন্য জরিমানা করা হয়। জার্মানি প্রচণ্ড অপমানিত হলেও ১৯৩১ সাল পর্যন্ত একটি বড় অংকের ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল। তবে এর ফলে স্বভাবতই ইউরোপের অন্য দেশগুলোর প্রতি জার্মানদের মনে ঘৃণা তৈরি হয়।

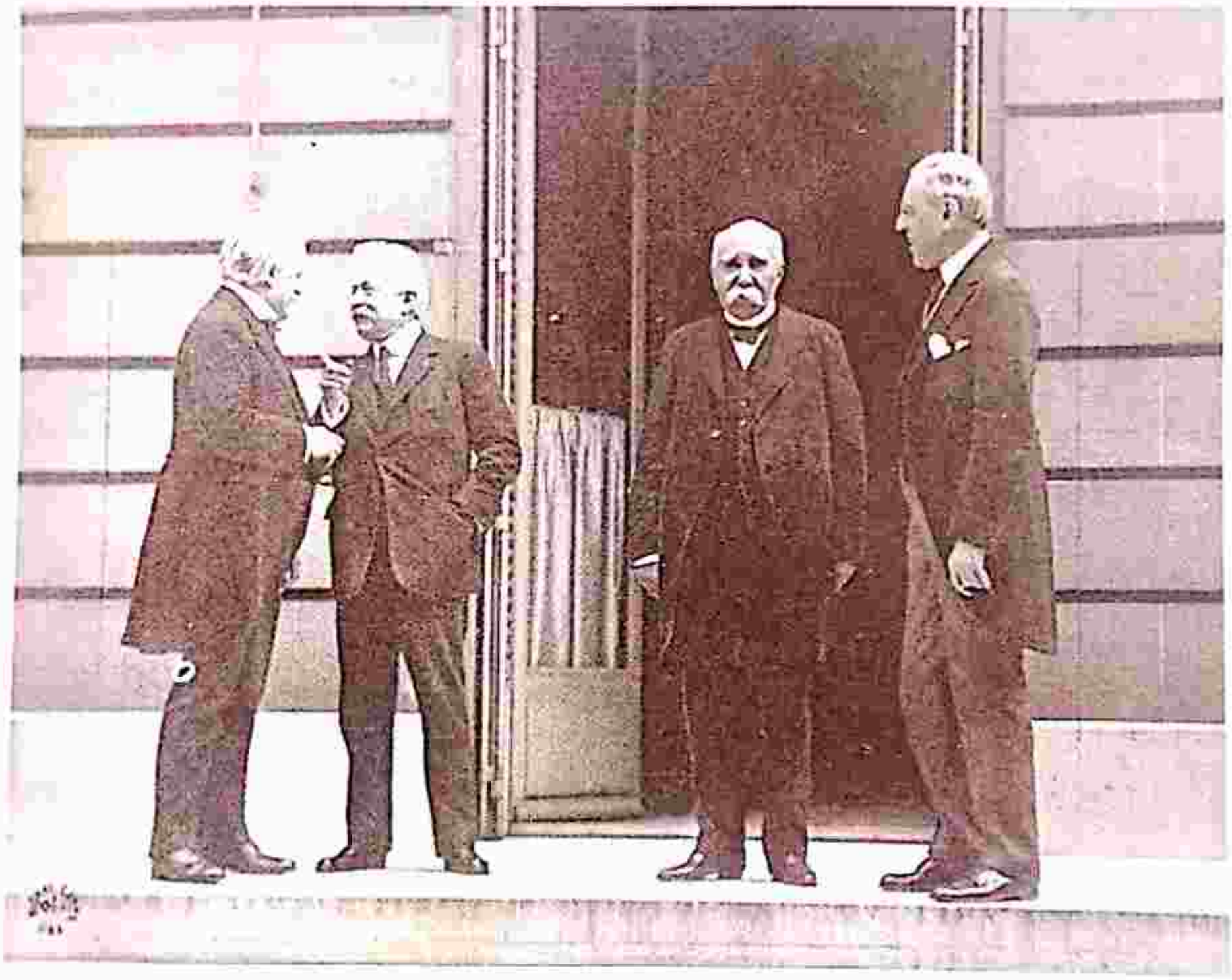

এই চার মহারথীই সিদ্ধান্তগুলো নেন প্যারিস শান্তি সম্মেলনে, এরা হলেন (বাম থেকে যথাক্রমে) যুক্তরাজ্যের ডেভিড লয়েড জর্জ, ইতালির ভিত্তোরিও এমানুয়েলে ওরলান্দো, ফ্রান্সের জর্জ ক্লেমঁসো এবং যুক্তরাষ্ট্রের উড্রো উইলসন

প্যারিস শান্তি সম্মেলনে নেয়া দুটো বড় সিদ্ধান্ত আমাদের এ বইয়ের পটভূমি বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সিদ্ধান্ত এক, একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে, যার নাম হবে 'লিগ অফ ন্যাশনস'। আর দুই, জার্মানি আর অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত যে যে বিদেশী এলাকাগুলো ছিল, সেগুলো মিত্রশক্তির মাঝে বিলি করে দেয়া, বিশেষ করে ফ্রান্স আর ব্রিটেনের মাঝে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জাতিসংঘ সৃষ্টির আগে পুরো বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক যে সংঘের উপস্থিতি ছিল, সেটিই লিগ অফ ন্যাশনস (League of Nations), যাকে সংক্ষেপে LON-I ডাকা হতো। প্যারিস শান্তি সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি জন্ম নেয় এ লিগ। জাতিসংঘ জন্ম নেবার আগ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত লিগ অফ ন্যাশনস তার কাজ চালিয়ে যায়। এর পতাকায় ব্রিটিশদের ভাষা ইংরেজি আর ফ্রান্সের ভাষা ফরাসিতে নাম লেখা ছিল (Société des Nations), যেমনটি এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—

লিগ অফ ন্যাশনসের পতাকা

তো যা বলছিলাম, যুদ্ধে পরাজিত দেশগুলোর বিদেশী অধিকৃত এলাকাগুলোকে বিলি করে দেবার কথা। এই এলাকাগুলোকে বলা হতো লিগ অফ ন্যাশনস ম্যান্ডেট। একেকটি ম্যান্ডেট একেক জয়ী দেশের অধীনে চলে গেল, তাদের দায়িত্ব— লিগ অফ ন্যাশনসের হয়ে এ জায়গাগুলোর দেখাশোনা করা, সেখানকার লোকদের অধিকার সংরক্ষণ করা। এই ম্যান্ডেটতন্ত্র তৈরি করা হয় লিগ অফ ন্যাশনস চুক্তিপত্রের আর্টিকেল ২২ অনুযায়ী। লিগ অফ ন্যাশনসের পর এগুলো জাতিসংঘের অধীনে চলে গিয়েছিল।

তিনটি শ্রেণী বা ক্লাসে ভাগ করা হয় ম্যান্ডেটগুলোকে। মোট ১৬টি ম্যান্ডেট। পশ্চিম এশিয়া কভার করা ক্লাস-এ'তে ৫টি, আফ্রিকা কভার করা ক্লাস-বি'তে ৭টি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল কভার করা ক্লাস সি'তে আছে ৪টি ম্যান্ডেট। আমাদের আলোচ্য বিষয় ক্লাস-এ, অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়া। এতে আছে সিরিয়া, ট্রান্সজর্ডান, মেসোপটেমিয়া, লেবানন আর ফিলিস্তিন।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়, ফিলিস্তিন কার অধিকারে যাবে?

'AGUE OF NATIONS.

MANDATE FOR PALESTINE,

TOGETHER WITH A

NOTE BY THE SECRETARY-GENERAL
RELATING TO ITS APPLICATION

TO THE

TERRITORY KNOWN AS TRANS-JORDAN,

under the provisions of Article 25

লিগ অফ ন্যাশনসের প্যালেস্টাইন ম্যান্ডেট

যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তখন মুসলিম-প্রধান ফিলিস্তিন অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে, খুব কম সংখক ইহুদীই এখানে বসবাস করত। তখন থেকেই

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্রিটিশ ওয়ার কেবিনেট চিন্তা করা শুরু করে ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ নিয়ে। তৈরি করা হয় 'বেলফোর ঘোষণা', যাকে ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়।

এই ঘোষণাটি মূলত একটি চিঠি, তাতে তারিখ দেয়া ২ নভেম্বর, ১৯১৭। চিঠিটি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব সেখানকার ইহুদী সমাজের নেতা লর্ড রথসচাইল্ডকে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেন আর আয়ারল্যান্ডের জায়োনিস্ট সংঘে প্রচার করা। জায়োনিস্ট বলতে বোঝায়, ইহুদীদের নিজস্ব এলাকা প্রতিষ্ঠা এবং সারা দুনিয়ায় ইহুদীদের প্রতিরক্ষার আন্দোলন।

বেলফোর ঘোষণায় বলা হয়, ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জন্য জাতীয় আবাসভূমি তৈরি করতে সায় দিচ্ছে, এবং এর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। তবে এতে করে যেন সেখানকার অইহুদী সম্প্রদায়ের অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। অন্যান্য দেশে বসবাসরত ইহুদীদের অধিকারও যেন অক্ষুণ্ন থাকে, সেটিও খেয়াল করতে হবে।

Foreign Office.
November 2nd, 1917.

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet

"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country"

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation

বেলফোর ঘোষণায় ইহুদী আবাসভূমি বললেও সেটি আলাদা রাষ্ট্র হবে কি না, সেটা বলা নেই। ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছে করেই সেটি চেপে যায়। তারা এটিও আলাদা করে নিশ্চিত করে যে, ফিলিস্তিনকে ইহুদী আবাসভূমি বললেও তারা কখনও চায়নি, পুরো ফিলিস্তিন জুড়েই ইহুদী আবাস হোক।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শরিফ হুসাইন বিন আলী, ছবিটি ১৯১৬ সালে তোলা

আজকে যা সৌদি আরব, তখন তা হেজাজ নামের পরিচিত ছিল। সেখানকার ক্ষমতা ছিল হাশেমি পরিবারের অধীনে। হাশেমিদের নেতা শরিফ হুসাইন বিন আলী ১৯১৫-১৯১৬ সালে দশটি চিঠি আদানপ্রদান করেন মিসরের ব্রিটিশ হাই

কমিশনারের সাথে। ১৯১৫ সালের ২৪ অক্টোবর যে চিঠি পাঠানো হয়, তাতে স্পষ্ট করে লেখাড় যদি বিশ্বযুদ্ধে অটোম্যানদের বিরুদ্ধে মক্কার নেতা শরিফ একটি বিদ্রোহ শুরু করতে পারে, তাহলে যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সরকার আরবদের স্বাধীনতা দেবে। মিত্রশক্তির বিরোধী পক্ষ ছিল অটোম্যানরা। যুদ্ধে জিততে হলে তাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা ব্রিটিশ সরকারের জন্য খুব জরুরি ছিল। কারণ, তাদের শাসিত খোদ ভারতবর্ষেই ৭ কোটি মুসলিম তখন, তারা নৈতিকভাবে সমর্থন দেয় অটোম্যান খেলাফতকে; এরকম অনেকেই যোগ দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে, এদেরকে বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু তারা যদি দেখে যে মক্কা নিজেই অটোম্যানদেরকে সমর্থন দেয় না, বরং মিত্রশক্তিকে দেয়, তাহলে এই বিশাল জনসংখ্যাকে নিজেদের পক্ষে পাবে ব্রিটিশ সরকার।

মক্কার নেতা শরিফ হুসাইন নির্দিষ্ট করে দিলেন যে তিনি কোন কোন আরব এলাকার স্বাধীনতা চান। তবে তিনি ফিলিস্তিনের কথা বলেছিলেন কি বলেননি, সেটা আজও বিতর্কের বিষয়। অন্যদিকে একই সময়ে সোভিয়েত আর ইতালির সায় নিয়ে যুক্তরাজ্য আর ফ্রান্স নিজেদের মাঝে একটি গোপন চুক্তি সেরে নেয়। এই চুক্তিতে ব্রিটেনের অধীনে চলে যায় আজকের ইসরাইল, ফিলিস্তিন, জর্ডান, ইরাকের দক্ষিণাংশ ইত্যাদি। এ তো গেল গোপনে হওয়া চুক্তি, কিছু সময় বাদে সেটি জনসম্মুখেও চলে এলো। এবার ফরমালিটির পালা।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনে এ নিয়ে আলোচনা হলো। ১৯২০ সালে লন্ডনের সম্মেলনেও সে আলোচনা চলতে থাকে। অবশেষে সে বছরের এপ্রিলে ইতালির উপকূলীয় শহর স্যানরেমো'তে হওয়া সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয়া হয়। মিত্রশক্তির সুপ্রিম কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, ফিলিস্তিন আর মেসোপটেমিয়ার ম্যান্ডেট গেল ব্রিটেনের কাছে, আর সিরিয়া ও লেবানন গেল ফ্রান্সের কাছে।

আরও বলা হলো, হেজাজের রাজা শরিফ হুসাইনের তিন ছেলে বা আমিরগণ বিভিন্ন বিজিত মুসলিম অঞ্চলের রাজা হবেন। ব্রিটিশদের আমন্ত্রণে প্যারিস সম্মেলনে আরবদের পক্ষ থেকে যোগ দেন হাশেমিদের প্রতিনিধি আমির ফয়সাল। বিশ্ব জায়োনিস্ট সংঘের পক্ষ থেকে যে দল এসেছিল, তাদের নেতা ছিলেন রুশ বায়োকেমিস্ট হাইম আজরিয়েল ওয়াইজম্যান, যিনি পরে গিয়ে ইসরাইলের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাইম ওয়াইজম্যান, ইসরাইলের প্রথম প্রেসিডেন্ট

এর আগেই অবশ্য ইহুদী জায়োনিস্টরা ফয়সালের সাথে দেখা করেছিল, প্রায় দু সপ্তাহ আগে। তখন তারা ফিলিস্তিনের ব্যাপারে ইহুদী পরিকল্পনার নিয়ে ফয়সালের সায় নেয়। কিন্তু সম্মেলনে তারা ফয়সালের হাতে লেখা সে শর্ত উপস্থাপন না করে চেপে যায়, যেখানে আমির ফয়সাল লিখেছিলেন, তিনি এ শর্তে সায় দিচ্ছেন যে, ফিলিস্তিনকেও স্বাধীনতা দিতে হবে অন্যান্য আরব দেশের মতো। এই চেপে যাওয়ার মধ্য দিয়েই ১৯১৯ সালের ৩ জানুয়ারি ফয়সালের সাথে ওয়াইজম্যানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যায়।

ফিলিস্তিন এখন পরিচিত হবে ব্রিটিশদের ম্যান্ডেট হিসেবে— ফিলিস্তিন ম্যান্ডেট।

সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রসঙ্গে আসি। 'অ্যালফাবেট' কথাটা এলো কীভাবে?

গ্রিক বর্ণমালার প্রথম দুই অক্ষর আলফা (α) আর বিটা (β)। এই অক্ষর দুটো থেকেই জন্ম নেয় গ্রিক শব্দ আলফাবিটোস, সেখান থেকে লাতিন আলফাবিটাম, আর সবশেষে ইংরেজি অযঢ়যধনবঃ।

কিন্তু কথা হলো, এই আলফা আর বিটা অক্ষরদুটোর নাম কীভাবে এলো? দুটোই এসেছে সেমেটিক অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যীয় ভাষা থেকে। মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবগুলো ভাষারই প্রথম দু অক্ষর এমন, যেমন ধরুন- আরবি আলিফ (ا), হিব্রু আলেফ (א), আরামায়িক আলাপ (ܐ), সিরিয়াক আলাপ (ܐ), এমনকি ফিনিসীয় আলেপ (𐤀)—এগুলো থেকে এসেছে গ্রিক আলফা (α)। আর আরবি 'বা' (ب), হিব্রু বেৎ (ב), আরামায়িক বেথ, সিরিয়াক বেৎ (ܒ) আর ফিনিসিয় বেৎড়এগুলো থেকে আসে গ্রিক বিটা (β)।

একদম গোঁড়ার সেমিটিক মূল অক্ষরনাম 'আলেফ'-এর অর্থ ছিল 'নেতা', কিংবা অন্যত্র অর্থ ছিল 'ষাঁড়'। কোনো কোনো হরফে আলেফকে ষাঁড়ের মাথা দিয়েই লেখা হতো, যেটা মিসরীয় হায়ারোগ্লি-ফের সাথে মিলে যায়।

আর, 'বেৎ'/'বেথ' এর আদি অর্থ ছিল 'ঘর'। 'বাইৎ' বা 'বেথ' এখনও 'ঘর' নামেই আছে। আরবি 'বাইতুল্লাহ' যেখানে আল্লাহর ঘর, হিব্রু 'বেথেলহেম' সেখানে 'বেথ-লেহেম' বা 'বাইত লাহাম', অর্থাৎ 'মাংসের ঘর'; কিন্তু সমস্যা হলো, 'লাহাম' মানে এখন 'মাংস' হলেও, বেথেলহেমের অর্থ আজকের অর্থ দিয়ে কিছুই বোঝা যাবে না। কারণ, 'লাহাম' বা 'লেহেম' প্রায় তিন হাজার বছর আগে ঐ অঞ্চলের স্থানীয় কানান-দেশীয়দের দেবতা ছিল। সেই দেবতার সাথে তারা আবার পরিচিত হয়েছিল আক্কাদীয় অর্থাৎ মেসোপটেমিয়া বা ইরাকি দেবতা 'লাহমু'-কে উপাসনা করতে দেখে, আর সেই 'লাহমু' ছিল উর্বরতার দেবতা। বাইতে লাহাম তাই 'লাহমের ঘর' (মন্দির) নামেই পরিচিত ছিল বহুকাল আগে, কিন্তু হিব্রুরা এ স্থান অধিকার করে নেবার পর এ অর্থ পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। আর যীশুর জন্মসূত্রে বেথেলহেম হয়ে পড়ে কিংবদন্তি, মুছে যায় প্রাচীন মেসোপটেমিয়ান সংযোগটি। কোথা থেকে কাহিনী কোথায় গড়ায়! অ্যালফাবেট নিয়ে বলতে গিয়ে কীভাবে যেন চলে এলো উর্বরতার দেবতা! ভালো কথা, এ উর্বরতা কিন্তু জমির উর্বরতা নয়!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আক্কাদীয় দেবতা লাহমুর মূর্তি

এবার আসা যাক কেন এই বর্ণমালা নিয়ে কথা বলতে গেলাম। 'আলিয়াহ আলেফ' আর 'আলিয়াহ বেৎ' (עלייה ב') ইহুদীদের মাঝে খুব গুরুত্ববহ দুটো বিষয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় আলিয়াহ। প্রথম আলিয়াহ বা আলিয়াহ আলেফ হলো, ব্রিটিশ ম্যান্ডেটে ব্রিটিশ সরকার যখন বৈধভাবে ইহুদীদেরকে অভিবাসী হতে অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু যখন থেকে সেটি সহজের দেয়া বন্ধ করে দেয় সরকার, তখন থেকে তারা অবৈধভাবে আসা শুরু করে। একেই বলা হয় দ্বিতীয় আলিয়াহ, বা আলিয়াহ বেৎ। আজকের ইসরাইলে একে ডাকা হয় 'হাপালাহ' (הַעְפָּלָה), যার অর্থ 'আরোহণ'। প্রশ্ন আসতে পারে, অবৈধভাবে কেন আসতে হবে? ব্রিটিশ সরকার কি খুশি মনেই ইহুদীদেরকে আসতে দেবার কথা না এখানে?

ইহুদীদের আলিয়াহ

ব্যাপারটা যত সহজ মনে হচ্ছে, আসলে তা নয়। এই দ্বিতীয় আলিয়াহ ১৯২০ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত চলে। এর বেশিরভাগ অবৈধ ইহুদী অভিবাসী ছিল নাৎজি জার্মানি থেকে পালিয়ে আসা, কিংবা হলোকস্ট থেকে বেঁচে আসা শরণার্থী ইহুদী। প্রথম দিকে ব্রিটেন ফিলিস্তিন আর ইউরোপীয় ইহুদীদের মধ্যে কোনো সম্পর্কই রাখতে চায়নি। সত্যি বলতে, খোদ ব্রিটেনেই আশি হাজার ইহুদীকে আশ্রয় দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এ পরিস্থিতি বদলাতে থাকে, এবং সীমিত পরিসরে তারা অনুমতি দিতে থাকে ফিলিস্তিনের একটি অংশে ইহুদীদের অভিবাসন। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ঘৃণা থেকে ধীরে ধীরে ইহুদী সন্ত্রাসী আন্ডারগ্রাউন্ড সংস্থাগুলো তৈরি হতে থাকে; যেমন, ইরগুন। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্যাতিত ইহুদীরা মিত্রপক্ষের সাথেই ছিল, অর্থাৎ ব্রিটিশদের পক্ষে। তাই এ সময়টুকু ইরগুনও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উৎপাত বন্ধ রাখে। ইহুদীরা এ সংঘগুলোকে 'প্যারামিলিটারি' সংস্থা ডাকত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

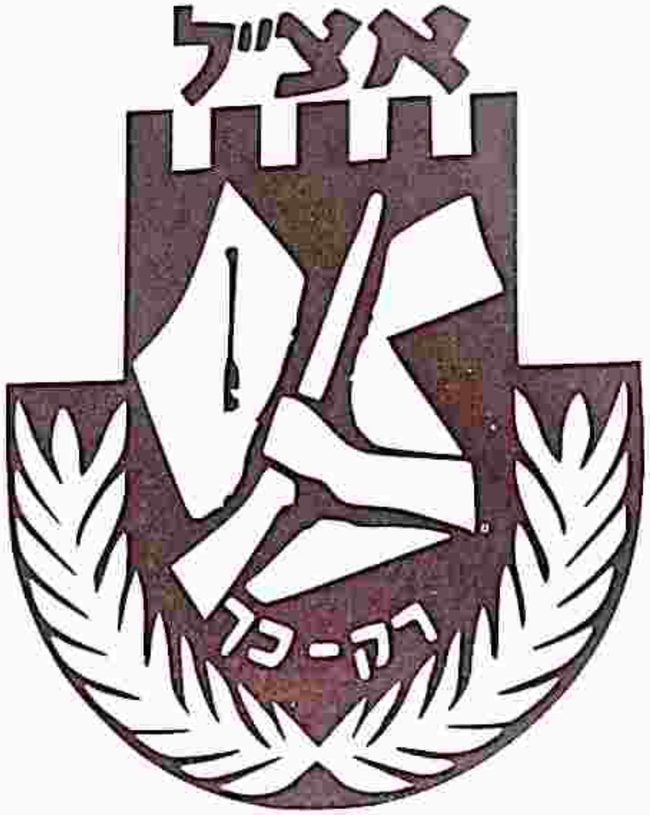

ইরগুনের লোগো

ইরগুনের পাশাপাশি 'লেহি' ছিল আরেকটি 'প্যারামিলিটারি' সংস্থা। লেহি ছিল হিব্রু 'লোহামেত হেরুত ইসরায়েল' (לח"י – לוחמי חרות ישראל) এর আদ্যক্ষর দিয়ে বানানো সংক্ষিপ্তরূপ, এর মানে ছিল 'ইসরাইলের স্বাধীনতাযোদ্ধা'। এছাড়াও ছিল 'হাগানাহ' (ההגנה) নামে আরেক সংস্থা, অর্থ 'প্রতিরক্ষা'; ১৯২০ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত এটি ছিল ফিলিস্তিনের ইহুদীদের প্রধান 'প্যারামিলিটারি' সশস্ত্র দল। হাগানার ফ্রন্টে কাজ করা গ্রুপের নাম ছিল 'পালমাখ' (פלמ"ח) বা 'পালমাহ', যার অর্থ 'স্ট্রাইক ফোর্স'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ ফিলিস্তিনের বিভক্তীকরণ নিয়ে ভোটের আয়োজন করে। এ প্রস্তাবে বলা হয়, এ অঞ্চলে মুসলিম ও ইহুদীদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের প্রবর্তন করা হবে, আর জেরুজালেম থাকবে বিশেষ আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে। এ সময় পর্যন্ত ইরগুন আর লেহি ব্রিটিশ সেনা ও পুলিশদেরকে আক্রমণ করতে থাকে। প্রথমে হাগানাহ আর পালমাখ ব্রিটিশদের পক্ষেই ছিল, ইরগুন আর লেহির বিরুদ্ধে লড়ছিল; কিন্তু এরপর ইহুদী মুক্তিকামী

হিসেবে ইরগুন আর লেহির পক্ষে যোগ দেয়। এর কিছুদিন বাদে তারা নিজেদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিরপেক্ষ দাবি করে। হাগানাহ নিজেও ফিলিস্তিনে ভয়াবহ আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। যেমন ধরুন, দেশের রেললাইন উড়িয়ে দেয়া, র‍্যাডার ধ্বংস করে দেয়া, ব্রিটিশ ফিলিস্তিনি পুলিশ স্টেশনগুলো ধ্বংস করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়টা জুড়ে হাগানাহ আলিয়াহ বেৎ আয়োজন করতে থাকে।

চলছে আলিয়াহ বেৎ

১৯৪৭ সালে আর না পেরে ব্রিটিশরা ঘোষণা করে তারা ফিলিস্তিন ম্যান্ডেট ছেড়ে দেবে, তারা ফিলিস্তিন ছেড়েই চলে যাচ্ছে। এজন্য তারা জাতিসংঘের সদয় দৃষ্টি চায়। বিভক্তীকরণ নিয়ে ভোটের পর ফিলিস্তিনে গৃহযুদ্ধ লেগে যায়। ইহুদী আর আরবদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে, ইহুদীরা আক্রমণ করছে, আরবরাও আক্রমণ করছেড়সে এক এলাহী কাণ্ড। দুই মাসে মারা যায় ৮০০ মানুষ। ম্যান্ডেট বিলুপ্তির ছয় সপ্তাহ আগেই তর সইলো না হাগানাহ, ইরগুন, লেহিদের। তারা ভয়ংকর আক্রমণ চালালো সেই এলাকাগুলো দখলের জন্য, বিভক্তীকরণ প্রস্তাব অনুযায়ী যেগুলো ইহুদীদের হবার কথা। তাইবেরিয়া, সাফেদ, হাইফা, জাফফা, আক্রা, বাইসানের মতো এলাকাগুলো থেকে পালিয়ে যায় আরবরা। ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় জেরুজালেম যুদ্ধ—দুই পক্ষই লড়াই করে জেরুজালেমের জন্য। তেলআবিব থেকে জেরুজালেম জুড়ে প্রায় সকল আরব গ্রাম দখল করে নেয় ইহুদী সন্ত্রাসী সংঘগুলো, মাটিতে গুঁড়িয়ে দেয় সেসব।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইরগুনের মর্টার আক্রমণে গুঁড়িয়ে গিয়েছে জায়গাটা, তেলআবিব আর জাফফার মাঝামাঝি এলাকা

দামেস্ক ফটকে গাড়ি বোমা ফাটিয়ে ইরগুন ২০ জনকে হত্যা করে। মুসলিমদের প্যারামিলিটারি সংস্থা নাজ্জাদা'র হেডকোয়ার্টার ধ্বংস করতে লেহি ট্রাকবোমা ব্যবহার করে, মারা যায় ১৫ আরব, আহত হয় ৮০। জেরুজালেমের সেমিরামিস হোটেল উড়িয়ে দেয় হাগানাহ, মারা যায় ২৪ জন। পরদিনও ইরগুন সন্ত্রাসীরা পুলিশের ভ্যান চুরি করে ব্যারেল বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে জাফফা ফটকে বেসামরিক লোকদের হত্যা করে, যারা বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল; সেদিন মারা যায় ১৬ জন। রামলার বাজারে ইরগুনের বোমা বিস্ফোরণে ৬ জন মারা যায়, আহত হয় ৪৫ জন। পালমাখ বাকি থাকবে কেন, তারাও হাইফাতে বোমা ফাটায় এক গ্যারেজে, মারা যায় ৩০ জন। ১৯৪৮ সালের ৯ এপ্রিল দেইর ইয়াসিন গণহত্যায় জেরুজালেমের নিকটস্থ দেইর ইয়াসিন গ্রামে ১০৭ জন ফিলিস্তিনি আরবকে হত্যা করে ইরগুন আর লেহি; এর মাঝে নারী ও শিশুও ছিল। এ অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত কিং ডেভিড হোটেল উড়িয়ে দেয়ার ঘটনা তো আছেই।

খুবই দ্বিমুখী ব্যাপার হলো, এরা একদম মোটা দাগেই সন্ত্রাসী সংঘ, এবং প্রচুর মানবহত্যার দায়ে দণ্ডিত। কিন্তু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলে মেইনস্ট্রিম মিডিয়া কখনও এ ইহুদী সন্ত্রাসী কর্মগুলো প্রচার করে না।

আর না পেরে জাতিসংঘ ইরগুনকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বলে ঘোষণা করে। এর পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকার, মার্কিন সরকার এবং নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার মতো প্রভাবশালী পত্রিকাও তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দেয়। এখানেই শেষ নয়, ইরগুনের নেতা মেনাখেম বেগিনকে খোদ আলবার্ট আইনস্টাইন এবং ২৭জন ইহুদী বুদ্ধিজীবী 'সন্ত্রাসী' ডাকেন, এবং এ নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমসে পত্র দেন; ১৯৪৮ সালের ৪ ডিসেম্বর পত্রটি প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে লেহি-কে সন্ত্রাসী আখ্যা দেয় কেবল জাতিসংঘ আর ব্রিটিশ সরকার।

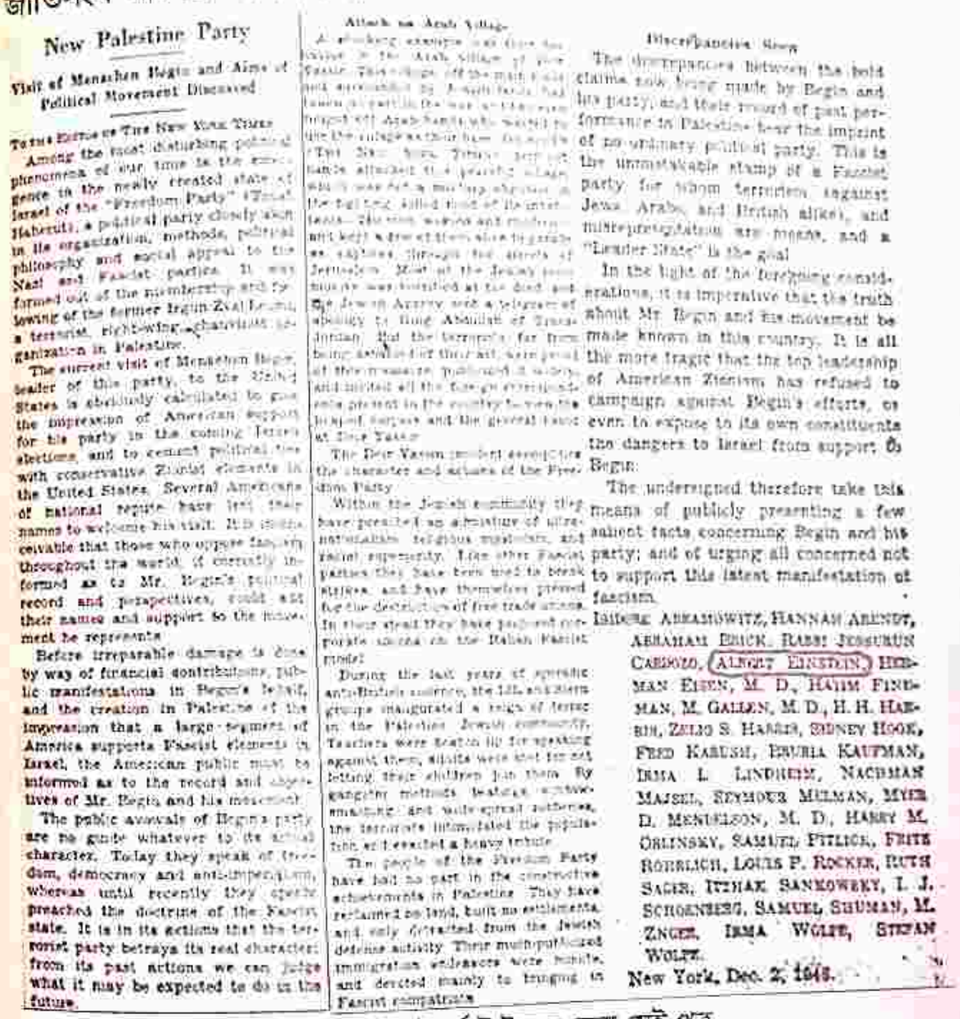

New Palestine Party

Visit of Menachen Begin and Aims of Political Movement Discussed

TO THE EDITOR OF THE NEW YORK TIMES:

Among the most disturbing political phenomena of our times is the emergence in the newly created state of Israel of the "Freedom Party" (Tnuat Haherut), a political party closely akin in its organization, methods, political philosophy and social appeal to the Nazi and Fascist parties. It was formed out of the membership and following of the former Irgun Zvai Leumi, a terrorist, right-wing, chauvinist organization in Palestine.

The current visit of Menachem Begin, leader of this party, to the United States is obviously calculated to give the impression of American support for his party in the coming Israeli elections, and to cement political ties with conservative Zionist elements in the United States. Several Americans of national repute have lent their names to welcome his visit. It is inconceivable that those who oppose fascism throughout the world, if correctly informed as to Mr. Begin's political record and perspectives, could add their names and support to the movement he represents.

Before irreparable damage is done by way of financial contributions, public manifestations in Begin's behalf, and the creation in Palestine of the impression that a large segment of America supports Fascist elements in Israel, the American public must be informed as to the record and objectives of Mr. Begin and his movement.

The public avowals of Begin's party are no guide whatever to its actual character. Today they speak of freedom, democracy and anti-imperialism, whereas until recently they openly preached the doctrine of the Fascist state. It is in its actions that the terrorist party betrays its real character; from its past actions we can judge what it may be expected to do in the future.

Attack on Arab Village

A shocking example was their behavior in the Arab village of Deir Yassin. This village, off the main roads and surrounded by Jewish lands, had taken no part in the war, and had even fought off Arab bands who wanted to use the village as their base. On April 9 (THE NEW YORK TIMES), terrorist bands attacked this peaceful village, which was not a military objective in the fighting, killed most of its inhabitants—240 men, women and children—and kept a few of them alive to parade as captives through the streets of Jerusalem. Most of the Jewish community was horrified at the deed, and the Jewish Agency sent a telegram of apology to King Abdullah of Trans-Jordan. But the terrorists, far from being ashamed of their act, were proud of this massacre, publicized it widely, and invited all the foreign correspondents present in the country to view the heaped corpses and the general havoc at Deir Yassin.

The Deir Yassin incident exemplifies the character and actions of the Freedom Party.

Within the Jewish community they have preached an admixture of ultranationalism, religious mysticism, and racial superiority. Like other Fascist parties they have been used to break strikes, and have themselves pressed for the destruction of free trade unions. In their stead they have proposed corporate unions on the Italian Fascist model.

During the last years of sporadic anti-British violence, the IZL and Stern groups inaugurated a reign of terror in the Palestine Jewish community. Teachers were beaten up for speaking against them, adults were shot for not letting their children join them. By gangster methods, beatings, window-smashing, and wide-spread robberies, the terrorists intimidated the population and exacted a heavy tribute.

The people of the Freedom Party have had no part in the constructive achievements in Palestine. They have reclaimed no land, built no settlements, and only detracted from the Jewish defense activity. Their much-publicized immigration endeavors were minute, and devoted mainly to bringing in Fascist compatriots.

Discrepancies Seen

The discrepancies between the bold claims now being made by Begin and his party, and their record of past performance in Palestine bear the imprint of no ordinary political party. This is the unmistakable stamp of a Fascist party for whom terrorism (against Jews, Arabs, and British alike), and misrepresentation are means, and a "Leader State" is the goal.

In the light of the foregoing considerations, it is imperative that the truth about Mr. Begin and his movement be made known in this country. It is all the more tragic that the top leadership of American Zionism has refused to campaign against Begin's efforts, or even to expose to its own constituents the dangers to Israel from support to Begin.

The undersigned therefore take this means of publicly presenting a few salient facts concerning Begin and his party; and of urging all concerned not to support this latest manifestation of fascism.

ISIDORE ABRAMOWITZ, HANNAH ARENDT, ABRAHAM BRICK, RABBI JESSURUN CARDOZO, ALBERT EINSTEIN, HERMAN EISEN, M. D., HAYIM FINEMAN, M. GALLEN, M. D., H. H. HARRIS, ZELIG S. HARRIS, SIDNEY HOOK, FRED KARUSH, BRURIA KAUFMAN, IRMA L. LINDHEIM, NACHMAN MAISEL, SEYMOUR MELMAN, MYER D. MENDELSON, M. D., HARRY M. ORLINSKY, SAMUEL PITLICK, FRITZ ROHRLICH, LOUIS P. ROCKER, RUTH SAGIS, ITZHAK SANKOWSKY, I. J. SCHOENBERG, SAMUEL SHUMAN, M. ZNGER, IRMA WOLFE, STEFAN WOLFE.

New York, Dec. 2, 1948.

নিউ ইয়র্ক টাইমসে দেয়া সেই পত্র

ইরগুন গংয়ের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এক এক করে বর্ণনা করা শুরু করলে, তাদের হরণ করা প্রাণের তালিকা তৈরি করলে, সেটিই একটি বইতে পরিণত হতে পারে।

১৯৪৮ সালের ১৪ মে ইসরাইলের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগুরিয়ন ইসরাইলের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন, সেদিন ছিল ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের শেষ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিন। তিনি ইসরাইলের আভ্যন্তরীণ গোপন ইন্টেলিজেন্সমূলক কাজের জন্য শিন-বেৎ সৃষ্টি করেন, আর আন্তর্জাতিক হুমকি সামাল দেবার জন্য তৈরি করেন দুর্ধর্ষ সিক্রেট সার্ভিস— মোসাদ। এই দুটো সংস্থার নাম ষাটের দশকের আগে মুখেই আনা নিষিদ্ধ ছিল। এতটাই গোপন ছিল এগুলোর কাজ কারবার!

ডেভিড বেনগুরিয়ন, ইসরাইলের সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রী

অধ্যায়-২

এক নজরে মোসাদ

মোসাদ নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই, আর এই অসীম কৌতূহলই যেন প্রতিষ্ঠানটিকে আরও রহস্যের চাদরে মুড়িয়ে দেয়। 'মোসাদ' শব্দের অর্থই কিন্তু প্রতিষ্ঠান বা, অফিস।

হিব্রুতে সংক্ষেপে হা-মোসাদ (המוסד) আর আরবিতে আল-মুসাদ (الموساد) ডাকা হয়। তবে পুরো হিব্রু নামখানা আরও বড়। "হা-মোসাদ লেমোদি-ইন উলে-তাফকিদিম মেয়ুহাদিম" (המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים), যার অর্থ "Institute for Intelligence and Special Operations"। (আরবিতে الخاصة و المهام للاستخبارات الموساد)

ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রধান এই মোসাদ। যদিও মোসাদ ছাড়াও সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা 'আমান' আর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা 'শিন বেৎ' কাজ করছে।

তবে মোসাদের সাথে বাকিদের পার্থক্য হলো, মোসাদ আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়, রাষ্ট্রের সাধারণ আইন মোসাদের ওপর প্রযোজ্য নয়। ইসরাইলের কোনো লিখিত আইনই মোসাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কাজ কর্ম, মিশন, বা অর্থকড়ি খরচ— এসবকে সংজ্ঞায়িত করে না।

তুর্কি ভাষায় একটি কথা আছে 'দেরিন দেভলেত', যাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয় 'ডিপ স্টেট' নামে। যখন রাষ্ট্রের নিয়ম নীতির বাইরে একটি প্রতিষ্ঠান গোপনে আর স্বাধীনভাবে কাজ করতে থাকে, তখন তাকে ডিপ স্টেট বলে। ডিপ স্টেটের মোক্ষম উদাহরণ এই 'মোসাদ'।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মোসাদের লোগো

মোসাদের মোটো বা ট্যাগলাইন হিসেবে আছে ওল্ড টেস্টামেন্টের বাণী, "সুমন্ত্রণার অভাবে জাতি হেরে যায়; কিন্তু কৌসুলির দরুন জয় নিশ্চিত হয়।" [প্রোভার্বস/মেসাল, ১১:১৪] তবে এর আগে মোসাদের মোটো ছিল, "যুদ্ধ করো জ্ঞানীদের দেখানো পথে।" (For by wise guidance you can wage your war) [প্রোভার্বস/মেসাল, ২৪:৬] বাংলাদেশি কিতাবুল মোকাদ্দাসে এ বাক্যের অর্থ করা হয়েছে, "সুমন্ত্রণার চালনায় তুমি যুদ্ধ করবে।"

মোসাদের প্রধান বা ডিরেক্টর কেবল ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর কাছেই রিপোর্ট করেন, আর কারও কাছে তার জবাবদিহিতা নেই। মোসাদের বাৎসরিক বাজেট ইসরাইলি মুদ্রায় প্রায় ১০ বিলিয়ন শেকেল, অর্থাৎ ২.৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। হারেৎস পত্রিকার ভাষ্যমতে, প্রায় সাত হাজার লোক কাজ করে মোসাদে, সিআইএ-র পর এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা সংস্থা।

মোসাদের ওয়েবসাইট হিব্রুর পাশাপাশি আরবিতে তো আছেই, এমনকি শত্রু রাষ্ট্র ইরানের ফার্সি ভাষাতেও করা আছে!

মোসাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট

১৯৪৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর 'সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর কোঅর্ডিনেশন' নামে মোসাদের জন্ম। প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন-গুরিয়ন বন্ধুবর রুবেন শিলোয়াহ'কে প্রথম ডিরেক্টর বানিয়ে মোসাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছিল সেই নিয়োগপত্র-

"সিক্রেট"

২২ কিসলেভ ৫৭১০
১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯
বরাবর- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
লেখক- প্রধানমন্ত্রী

আমি আদেশ করছি যে, রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে সমন্বয় করার জন্য একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হবে।
আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রুবেন শিলোয়াহকে এ ইনস্টিটিউটের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছি। রুবেন শিলোয়াহ রিপোর্ট করবেন আমার কাছে। তিনি আমার আদেশে কাজ করবেন। কাগজে কলমে, তার অফিস হবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
আমি রুবেন শিলোয়াহকে জনবল ও বাজেট নিয়ে প্রস্তাবনা জমা দিতে বলেছি ১৯৫০-১৯৫১ অর্থবছরের জন্য, যার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরিমাণ হবে ২০,০০০ ইসরাইলি মুদ্রা। এর মাঝে ৫০০০ মুদ্রা হবে স্পেশাল অপারেশনের জন্য।
খরচের এ অংকটা এই অর্থবছরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাজেটের সাথে যোগ করে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডি বেন গুরিয়ন

১৯৫১ সাল থেকে সংবিধানের বাইরে গিয়ে কেবল প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট করতে শুরু করে মোসাদ।

রুবেন শিলোয়াহ, মোসাদের প্রথম ডিরেক্টর

এতশত কর্মীর সবচেয়ে বড় ডিপার্টমেন্টের নাম 'কালেকশনস', এদেরকে দেশের বাইরে নানা স্থানে রাখা হয় গুপ্তচরবৃত্তির জন্য। কেউ কেউ কূটনীতিক হিসেবে থাকে, কেউ বা থাকে আন্ডারকভারে। লিয়াজোঁ ডিপার্টমেন্ট কাজ করে অন্যান্য দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথে। মোসাদের রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট নিয়মিত গোয়েন্দা রিপোর্ট ঘেঁটে তথ্য বের করতে থাকে, আর টেক ডিপার্টমেন্ট মোসাদের এজেন্টদের জন্য আধুনিক সব যন্ত্রপাতি তৈরি করে।

মোসাদের মেৎসাদা ইউনিটের কাজ শত্রুকে আক্রমণ করা। ছোট ছোট এ দলগুলো স্যাবোটাজ আর গুপ্তহত্যা চালায় নিয়মিত।

মোসাদের আটটি ডিপার্টমেন্টের একটি হলো সিজারিয়া ডিপার্টমেন্ট। এর একটি ইউনিটের নাম কিদোন ইউনিট। জন্মসূত্রে আমেরিকান ইসরাইলি সাংবাদিক ইয়াকুব কাৎজ এই কিদোন ইউনিট নিয়ে লিখেছেন, "অত্যন্ত দক্ষ এ অ্যাসাসিন বা গুপ্তঘাতকদের দলটি সিজারিয়ার হয়ে কাজ করে। এদের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। মোসাদের সবচেয়ে বড় সিক্রেটগুলোর একটি এই কিদোন ইউনিট।" এদেরকে ইসরাইলি ডিফেন্স ফোর্স থেকে আনা হয়। এ পর্যন্ত ২৭০০ গুপ্তহত্যা মিশন অফিশিয়ালি সম্পন্ন করেছে মোসাদের কিদোন। হিব্রুতে কিদোন (כִּידוֹן) অর্থ হলো 'বর্শার আগা'। কথিত আছে মিউনিখ অলিম্পিকের সময় ইসরাইলি দলের ১১ জন সদস্যকে খুন করার বদলা হিসেবে যে অপারেশন 'র‍্যাথ অফ গড' চালানো হয়, সেটি কিদোন ইউনিটেরই করা। ২০ বছর ধরে তারা সে হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয় ফিলিস্তিনি ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর ও পিএলও-র ওপর।

ইসরাইলি ডিফেন্স ফোর্সের সরবরাহ করা ছবি, ইসরাইলি সেনারা অনুশীলন করছে। কিদোন ইউনিটে সুযোগ পাবার জন্য ইসরাইলি আর্মির বিশেষ এ "সায়েরেত মাৎকাল" ইউনিটের সদস্যরা অগ্রাধিকার পায়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মোসাদকে ইসরাইলি যেসব সাধারণ বেসামরিক মানুষ দেশপ্রেম অনুভূতি থেকে সাহায্য করে, তাদেরকে ডাকা হয় 'সায়ানিম' (סַיָּנִים) বা সাহায্যকারী। মোসাদের ফিল্ড এজেন্ট বা 'কাৎসাস' তাদেরকে রিক্রুট করে। সায়ানিম বহুবচন, আর সায়ান একবচন। একজন সায়ানের যদি গাড়ির এজেন্সি থাকে, তাহলে সে তার কোম্পানির গাড়ি মোসাদকে বিনা ডকুমেন্টে ব্যবহার করতে দিয়ে সাহায্য করতে পারে। সায়ানদের কারণে মোসাদের অপারেশনগুলোর খরচ বহুলাংশে কমে যায়। বাজেট কাটিংয়ের জন্য তাই সায়ানিমের গুরুত্ব মোসাদের জন্য অনেক। সায়ান'রা সাধারণত ইসরাইলি হয় না, তবে কেউ কেউ দ্বৈত নাগরিকত্বের অধিকারী হতে পারে, যার একটি দেশ ইসরাইল। ১৯৬০ সাল থেকে সায়ানিম প্রথা চলে আসছে। ব্রিটেনে প্রায় ৪,০০০ সায়ানিম আর যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৬,০০০ সায়ানিমের কথা চলতি শতাব্দী শুরু হবার আগেই জানা যায়। ইসরাইলি যেসব ছাত্রছাত্রী মোসাদের হয়ে ডেলিভারির কাজ করে, তাদেরকে ডাকা হয় 'বোদলিম'।

এ পর্যন্ত মোসাদের ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন বারো জন—

প্রথম ডিরেক্টর- রুবেন শিলোয়া, ১৯৪৯-৫৩
দ্বিতীয় ডিরেক্টর- ইসার হারেল, ১৯৫৩-৬৩
তৃতীয় ডিরেক্টর- মেইর আমিত, ১৯৬৩-৬৮
চতুর্থ ডিরেক্টর- ৎজভি জামির, ১৯৬৮-৭৩
পঞ্চম ডিরেক্টর- ইৎসহাক হোফি, ১৯৭৩-৮২
ষষ্ঠ ডিরেক্টর- নাহুম আদমনি, ১৯৮২-৮৯
সপ্তম ডিরেক্টর- শাবতাই শাভিত, ১৯৮৯-৯৬
অষ্টম ডিরেক্টর- ড্যানি ইয়াতোম, ১৯৯৬-৯৮
নবম ডিরেক্টর- এফ্রাইম হালেভি, ১৯৯৮-২০০২
দশম ডিরেক্টর- মেইর দাগার, ২০০২-২০১১
একাদশ ডিরেক্টর, তামির পারদো, ২০১১-২০১৬
দ্বাদশ ডিরেক্টর, ইয়োসি কোহেন, ২০১৬-২০২১
ত্রয়োদশ ডিরেক্টর, (বই লেখার সময় নাম ঘোষিত হয়নি), ২০২১-?

মোসাদের অপারেশন এত বড় আর বিশ্বজুড়ে হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের হেডকোয়ার্টারের ব্যাপারে একদমই নিশ্চুপ। কাগজে কলমে কোথাও এর অবস্থান লেখা হয় না। তবে ধারণা করা হয়, তেল-আবিবের টিলার ওপর অবস্থিত নিচের ছবির দালানটিই মোসাদের হেডকোয়ার্টার।

এ দালানটিকে মোসাদের হেডকোয়ার্টার বলে ধারণা করা হয়

মোসাদে ১৩ বছর কাজ করার সুবাদে সে সময়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই লিখেছেন মাইকেল রস নামের একজন কানাডীয় বংশোদ্ভূত প্রাক্তন মোসাদ এজেন্ট। বইটির নাম **"দ্য ইনক্রেডিবল ট্রু স্টোরি অফ অ্যান ইসরাইলি স্পাই অন দ্য ট্রেইল অফ ইন্টারন্যাশনাল টেরোরিস্টস"**। মোসাদ হেডকোয়ার্টার নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এর বিস্তারিত বিবরণ দেন, কেবল অবস্থান ছাড়া—

"মোসাদের হেডকোয়ার্টারের সত্যিকারের লোকেশন জানানো নিষেধ, তাই ওটা বলছি না। তবে এটুকু বলতে পারি, হেডকোয়ার্টারটি বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে বানানো হয়েছে; খুবই অত্যাধুনিক আর হাই সিকিউরিটি সম্পন্ন। ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস ক্যাম্পাস ভাব আছে এতে। খোলামেলা জায়গা আর বাগান লো চমৎকারভাবে দেখাশোনা করা হয়। শহরের হইচই অফিসকে স্পর্শই করে না। এখানে সেখানে বিখ্যাত শিল্পীদের সব চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্য। ভেতরে শুটিং রেঞ্জ আছে, খাওয়ার জায়গা আছে। মোসাদের খাবার হলো কোশার, অর্থাৎ যা ইহুদীদের জন্য হালাল। চমৎকার একটা জিম আছে, আমি সেখানে বাস্কেটবল খেলতাম।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"মোসাদের এজেন্ট অনেক হতে পারে, কিন্তু সেই অনুযায়ী অফিসটা অতো বিশাল না। সাত সকালেই পার্কিং লট ভরে যেতে থাকে গাড়িতে। আর অফিসে মানুষ থাকে অনেক রাত পর্যন্ত। সত্যি বলতে, মোসাদের অফিস ২৪ ঘন্টাই চালু থাকে। কেউ না কেউ কাজ করে।

"ফিল্ড এজেন্টদের হেডকোয়ার্টারে তেমন কাজ নেই। আমি নিজেই ৭-৮ বছর কাজ করার আগে পা রাখিনি হেডকোয়ার্টারে। অনেকেই আছেন, যারা সারা জীবন বিদেশে কাজ করে গিয়েছেন, তারপর অবসরও নিয়েছেন, কিন্তু তারা কোনোদিন হেডকোয়ার্টারে আসেননি। যারা ফিল্ডে কাজ করে না, তাদের প্রোমোশনও দেয়া হয় না। মোসাদে ইংরেজি আর হিব্রু দুটোই অফিশিয়াল ভাষা। কিন্তু ইংরেজি কমই ব্যবহার হতে দেখেছি; সবাই হিব্রুতেই কথা বলে, লেখে।

"সকাল সাড়ে ৫টায় উঠে রেডি হয়ে ৪৫ মিনিট ড্রাইভ করে যেতাম হেডকোয়ার্টারে। সাধারণত ১২-১৪ ঘন্টা দৈনিক কাজ করতে হতো, কিন্তু সন্ত্রাসী আক্রমণের হুমকি থাকলে আরও বেশি সময় দিতে হয়। হেডকোয়ার্টারে যখন কাজ করতাম, তখন নিজের জন্য সময়ই পেতাম না। এর চেয়ে আন্ডারকভার কাজ করাতে আরাম বেশি, ঘুমাবার সময় পাওয়া যায়।"

১৯৪৯ সালে মোসাদের যাত্রা শুরু হলেও, ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মোসাদ প্রধানদের নাম পরিচয় গোপনই রাখা হতো। সপ্তম ডিরেক্টর শাবতাইয়ের পর যখন ড্যানি ইয়াতোমকে নিয়োগ দেয়া হয়, তখন সকলে জানতে পারে প্রথমবারের মতো মোসাদের মাথা কে।

ড্যানি ইয়াতোম, মোসাদের সপ্তম ডিরেক্টর

মোসাদকে নিয়ে জানার আগ্রহের কমতি নেই বিশ্বব্যাপী, কিন্তু বিভিন্ন সময় ফাঁস হওয়া তথ্য আর লোকের ইন্টারভিউ ছাড়া অফিসিয়ালি মোসাদ সম্পর্কে জানার উপায় আসলে নেই। কালেভদ্রে ইসরাইল থেকে হয়তো কিছু তথ্য অফিশিয়ালি দেয়া হয়, যেমন সিরিয়ার 'সন্দেহভাজন' নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর ধ্বংসের মিশনের ছবি ছাড়া হয়েছিল, যা সম্ভব হয়েছিল মোসাদের দেয়া তথ্যের কারণেই।

ইসরাইলি আর্মি থেকে পাওয়া এ ছবিতে বাম পাশে সিরিয়ার সম্ভাব্য একটি নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর বোমা হামলার আগে এবং ডান পাশে হামলার পরের ছবি দেখা যাচ্ছে (সেপ্টেম্বর ৬, ২০০৭)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধ্যায়-৩

একজন ছায়ামানব: মোসাদের পুনরুত্থান

বাংলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ চলছে, সেই সময়ের কথা। ১৯৭১ সালের গ্রীষ্মকালের শেষ দিকে ভূমধ্যসাগরের তীরে ভয়ংকর ঝড় চলছে। উঁচু উঁচু ঢেউ এসে গাজার বালুকাবেলায় আছড়ে পড়ছে, বালুর নাম নিশানা আর নেই। স্থানীয় আরব জেলেরা বুদ্ধিমানের মতো সেদিন আর সাগরে যায়নি মাছ ধরতে। জীবিকার চাইতে জীবনের দাম বেশি, এই অবস্থায় সমুদ্র পাড়ি দেয়ার সাহস এখানকার নিরীহ মাঝিদের কারও নেই।

অদূরেই দেখা যাচ্ছে গাজার সমুদ্র সৈকত

এদের সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে উঁচু উঁচু ঢেউগুলোর মাঝ থেকে এক জীর্ণশীর্ণ নৌকা বেরিয়ে এলো, অবস্থা খুবই খারাপ। ঢেউয়ের সাথে সাথে নৌকাটিও আছড়ে পড়লো তীরের ভেজা বালুতে। এই অবাক করা দৃশ্য দেখতে থাকা লোকেরা দেখতে পেল, সেই নৌকা থেকে কয়েকজন ফিলিস্তিনি আরব বেরিয়ে এলো, তাদের জামাকাপড় আর মাথার চেক চেক নকশার ফিলিস্তিনি কুফিয়া পুরোই ভিজে গিয়েছে। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, অনেক লম্বা সময় সাগরে কাটিয়েছে।

কিন্তু তাদের থামবার সময় নেই। পেছনে যেন যমদূত তাড়া করছে। তারা পাগলের মতো দৌড়াতে লাগলো!

কিছুক্ষণের মাঝেই বোঝা গেল, কাদের কাছ থেকে পালাচ্ছে। উত্তাল সাগরের বুক থেকে ইসরাইলি টর্পেডো বোট বেরিয়ে এলো, এরাই তাড়া করছিল তাদেরকে। বোটের সবার পরনে একদম যুদ্ধের পোশাক। টর্পেডো বোটটি তীরে এসে ভীড়তেই অগভীর পানিতে লাফিয়ে নেমে পড়লো সৈন্যরা, আর সাথে সাথেই ছুটতে থাকা ফিলিস্তিনিদের দিকে গুলির পর গুলি ছুড়তে শুরু করল।

গাজার কয়েকজন কিশোর বিচে খেলাধুলো করছিল, তারা ফিলিস্তিনিদের বিপদ দেখতে পেয়ে তাদের দিকে দৌড়ে গেল, এরপর তাদেরকে লুকোতে নিয়ে গেল এক বাগানে। ইসরাইলি সেনারা তাদের আপাতত হারিয়ে ফেলল, তবে খুঁজতে থাকলো সমুদ্রতীর জুড়ে।

সেদিন রাতে এক তরুণ ফিলিস্তিনি কালশনিকভ বন্দুক নিয়ে সেই বাগানে এলো। সে দেখতে পেলো এক কোণায় পালিয়ে আসা লোকগুলো বসে আছে।

সে জিজ্ঞেস করলো, "এরা কারা?"

"ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে থাকা পপুলার ফ্রন্টের (পিএফএলপি) সদস্য; ওরা লেবাননের টায়ার শরণার্থী শিবির থেকে এসেছে।"

"মারহাবা," বলল সেই তরুণ, "স্বাগতম!"

লেবানন থেকে আসা সেই ফিলিস্তিনিদের একজন বলল, "আপনি কি আবু সাইফকে চেনেন? আমাদের কমান্ডার উনি। তার নির্দেশেই আমরা এখানে, মানে গাজায় এসেছি। আমাদের হাতে টাকাপয়সা ও অস্ত্র আছে, কিন্তু অপারেশনগুলো ম্যানেজ করবার লোক দরকার।"

"আমি সাহায্য করব আপনাদেরকে," বলল সেই তরুণ।

পরদিন সকালে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের ভেতরে এক শূন্য বাসায়। ভেতরের বড় এক কক্ষে তাদেরকে টেবিলে বসতে দেয়া হলো। কিছুক্ষণের মাঝেই, লোকের পর লোক আসতে লাগলেন, সবাই পপুলার ফ্রন্টের কমান্ডার, যাদের দেখা পেতে এসেছে তারা লেবানন থেকে। তারা উষ্ণ মোবারকবাদ বিনিময় করে মুখোমুখি আলোচনা করতে বসলো।

লেবানিজ দলটির যার মাথায় লাল কুফিয়া পরিধান করা, সেই সম্ভবত তাদের নেতা। বয়স খুব কম, কিন্তু এখনই মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে। দেরি না করেই সে বলল, "সবাই কি এসেছে? শুরু করতে পারি কথা?"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

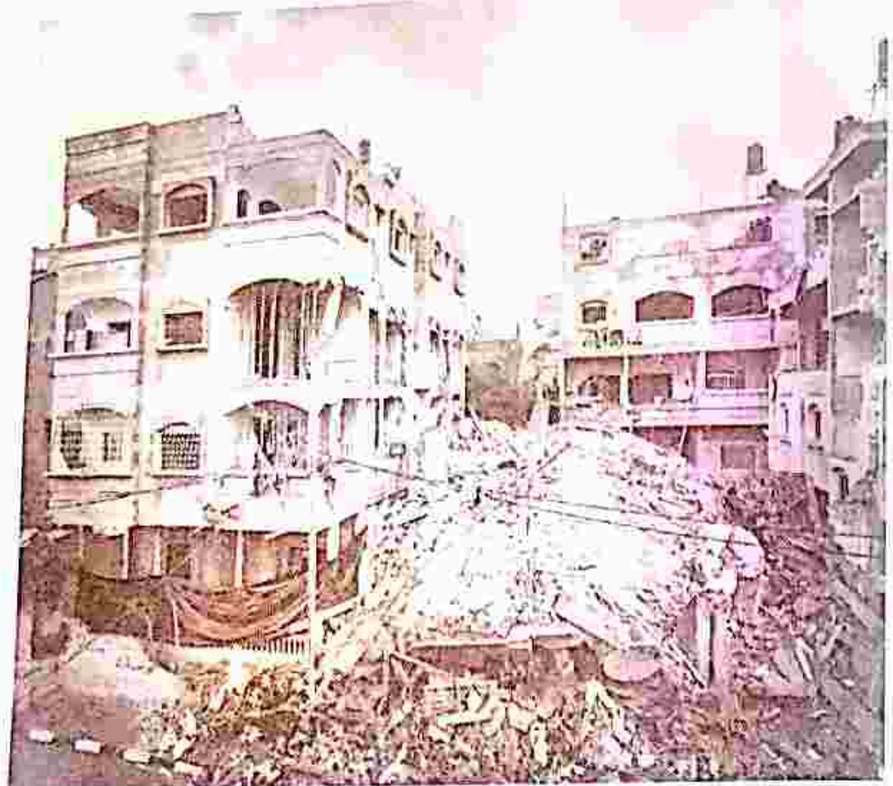

জাবালিয়া শরণার্থী ক্যাম্পের একটি বাসা

"জ্বি, সবাই এসেছে," উত্তর এলো।

লেবানিজ নেতা তার হাত উঁচু করলো, এরপর হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো। এটা ছিল আগে থেকে ঠিক করে রাখা সিগনাল। সাথে সাথে সেই 'লেবানিজ' লোকেরা হ্যান্ডগান বের করে গুলি শুরু করলো। ঠিক এক মিনিটের মাঝেই গাজার বেৎ লাহিয়া এলাকার ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী কমান্ডাররা নিহত হলেন। আর সেই 'লেবানিজ'-রা জাবালিয়া ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে গাজার রাস্তার ভীড়ে হারিয়ে গেল, খুব শীঘ্রই তারা ঢুকে পড়লো ইসরাইলি এলাকায়। এখন তারা নিরাপদ।

সেদিন সন্ধ্যায় সেই লাল কুফিয়া পরিহিত ক্যাপ্টেন মেইয়ার দাগান একজনকে খবর দেবেন। ক্যাপ্টেন দাগান ইসরাইলি ডিফেন্স ফোর্সের (আইডিএফ) একজন কমান্ডার, আরও খুঁটিয়ে বলতে গেলে, আইডিএফ-এর রিমন কমান্ডো ইউনিটের কমান্ডার। যাকে খবর দেয়ার কথা, তার নাম জেনারেল আরিয়েল শ্যারন, লোকে তাকে ডাকে 'আরিক' নামে। আজকের 'অপারেশন ক্যামিলিয়ন' যে বেশ সফল, সেটা জানানোই তার উদ্দেশ্য।

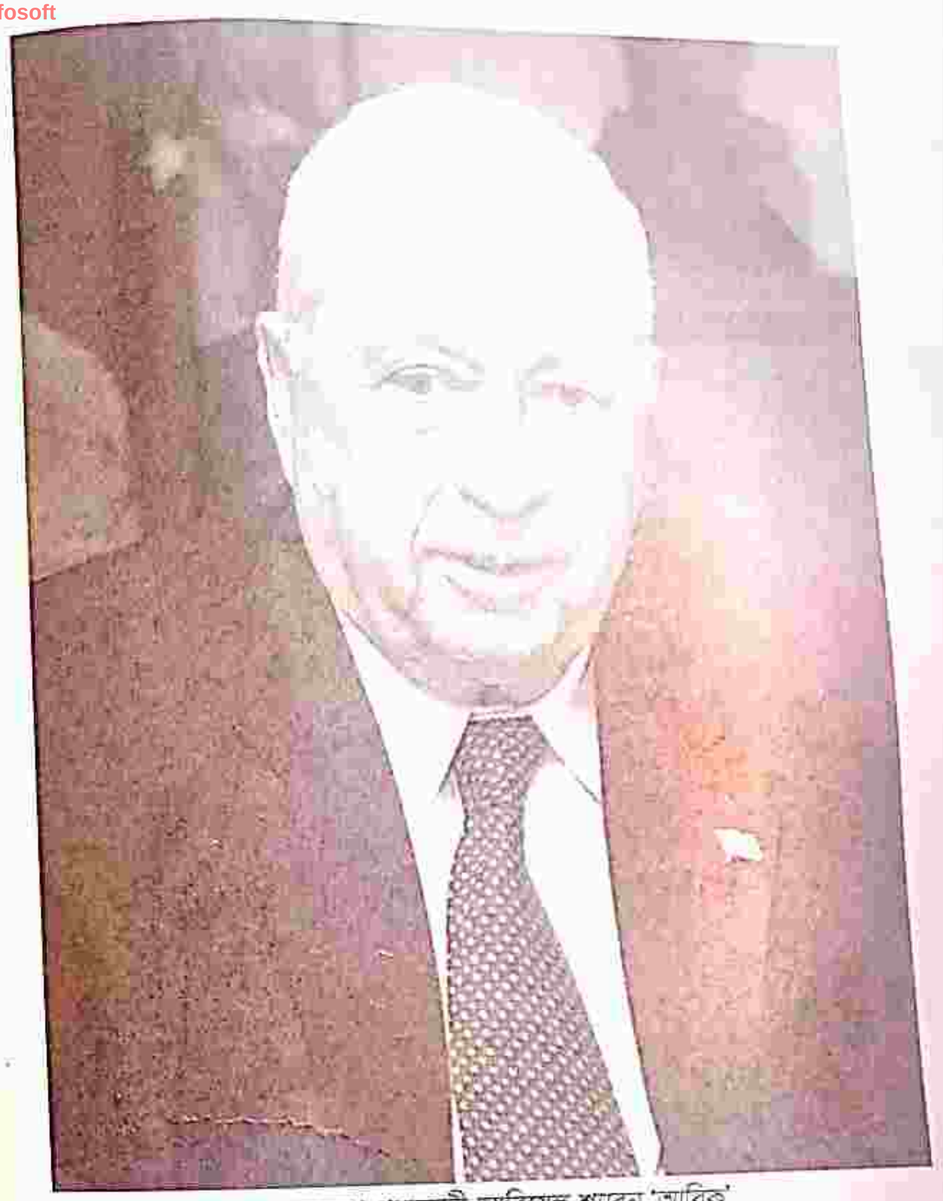

একাদশ প্রধানমন্ত্রী আরিয়েল শ্যারন 'আরিক'

দাগানের বয়স মাত্র ছাব্বিশ। কিন্তু এখনই তার নামডাক চারিদিকে। 'চারিদিক' বলে বোঝানো হচ্ছে, আর্মি আর ইন্টেলিজেন্সের লোকদের মাঝে। আজকের পুরো অপারেশনের খুঁটিনাটি তারই নকশা করা। লেবানিজ যোদ্ধা সেজে ইসরাইলিদের দ্বারা ভুয়া তাড়ার পুরো ঘটনাটাই দাগান সাজিয়েছেন, যেন ফিলিস্তিনিরা বুঝতেই না পারে যে তারা আসলে ইসরাইলি যোদ্ধা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৯৯২ সালে দাগান

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ইৎসহাক রাবিন একবার বলেছিলেন, "দাগান এমনভাবে নকশা সাজাতে জানে যে আপনার মনে হবে এটা আসলে বাস্তব অপারেশন নয়, থ্রিলার মুভি।"

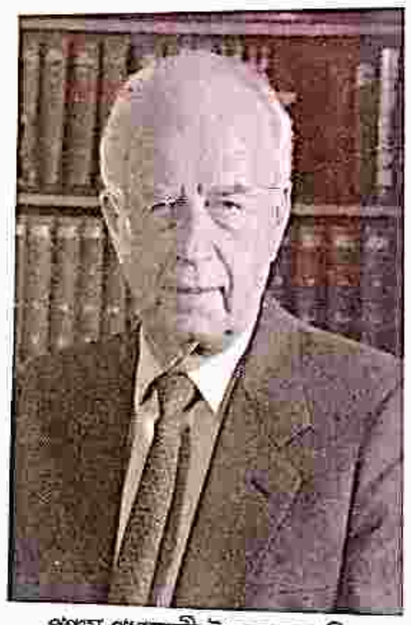

পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী ইৎসহাক রাবিন

তরুণ দাগানের ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা বাদামি চুল। ধারালো ছোড়া ছুড়ে মারার প্রতিযোগিতায় তার কোনো জুড়ি নেই। যেকোনো টার্গেটকে নিখুঁত এক কমান্ডো ছোঁড়া দিয়ে শেষ করে দিতে পারেন। কিন্তু ভাগ্যের লীলাখেলায় তিনি সামরিক পরীক্ষায় ফেল করে বসেন, শেষমেশ একজন প্যারাট্রুপার হিসেবে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

১৯৬৭ সালে 'তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ' নামের ছয়-দিনের যে যুদ্ধটা হয়েছিল, সেটায় ইসরাইল গাজা অধিকার করে নেয়। সত্তরের দশকের শুরুতে গাজা ভূখণ্ডে দাগানকে পাঠানো হয়। ইসরাইল বিরোধী ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী যোদ্ধায় তখন গিজগিজ করছে গাজা। ইসরাইল প্রতিরক্ষা বাহিনী শরণার্থী শিবিরগুলোর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসেছে বলা চলে। তখন জেনারেল অ্যারিয়েল শ্যারনের মনে হলো, কিছু একটা করা দরকার। তিনি পুরনো দিনের কিছু চেনা জানা লোককে ডেকে নিলেন, তাদের মধ্যে দাগান একজন।

ছয় দিনের যুদ্ধের সময় অ্যারিয়েল শ্যারন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দাগান একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন, ছয়-দিনের যুদ্ধে তিনি এক মাইনের ওপর পাড়া দিয়েছিলেন। দক্ষিণ ইসরাইলের সবচেয়ে বড় শহর বীরশেবার সোরোকা হাসপাতালে তাকে অনেকদিন চিকিৎসা নিতে হলো, কিন্তু চিকিৎসার সময়টা তার মধুরই কেটেছে বলা চলে। কারণ আর কিছুই না, প্রেমে পড়েন তিনি সেখানে! তার শুশ্রূষাকারী নার্স বিনা'কে ভালোবেসে ফেলেন: হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই বিয়ে করে নেন দুজনে।

আরিয়েল শ্যারন যে ইউনিটটা দাঁড়া করালেন, কাগজে কলমে তার কোনো অস্তিত্বই রাখা হয়নি। এ ইউনিটের মূল উদ্দেশ্য, গাজার সশস্ত্র ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের যেকোনো উপায়ে ঘায়েল করা, কোনো নিয়ম নীতি মানতে হবে না সেজন্য। দাগান গাজায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন একটা লাঠি, ডোবারমেন কুকুর, কিছু বন্দুক আর সাবমেশিনগান নিয়ে। কখনো ঘুরে বেড়ান আরব সেজে গাধার পিঠে চড়ে। ইসরাইলকে যারা শত্রুজ্ঞান করে, তাদের খতম করে দেয়াই তার লক্ষ্য।

এ ইউনিটের ভেতরে দাগান আরেকটি ছোট ইউনিট বানিয়ে নিলেন, নাম হলো 'রিমন' ইউনিট। রিমন ছিল ইসরাইলের প্রথম আন্ডারকভার কমান্ডো ইউনিট। তারা ফিলিস্তিনি সশস্ত্র আস্তানাগুলোতে আরব সেজে ঘুরে বেড়াত। আরিয়েল শ্যারনের 'হিট টিম' নামে তাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। কথিত আছে, তারা বন্দীদেরকেও ঠাণ্ডা মাথায় খুন করত। এমনও হয়েছে, তারা কোনো ফিলিস্তিনি যোদ্ধাকে এক অন্ধকার গলিতে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে বলল, "তোমার হাতে দু মিনিট সময় আছে পালিয়ে যাবার।" তারপর, সে পালাতে চেষ্টা করতেই গুলি করে মেরে ফেলত।

তৎকালীন সময়ে দাগান (মাঝে)

সাংবাদিকরা পর্যন্ত রিপোর্ট করেছিল, প্রত্যেক সকালে নাকি দাগান মাঠে যেতেন প্রস্রাব সারতে। এক হাতে প্রস্রাবের নিশানা ঠিক করতেন, অন্য হাতের বন্দুক দিয়ে উড়িয়ে দিতেন কোনো শূন্য কোকের ক্যান। দাগানের কাছেও এ রিপোর্ট পৌঁছে। শুনে তিনি হালকা গলায় বলেন, "আমাদের সবার ব্যাপারেই নানা কথা প্রচলিত আছে। তবে যা রটে, তার কিছু তো বটে।"

প্রায় প্রতি রাতেই দাগানের লোকেরা কোনো নারী বা ছেলের ছদ্মবেশ নিয়ে বেরিয়ে পড়ত ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের খোঁজে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে তারা আরব সেজে গাজার উত্তর দিকে যায় এবং ফাতাহ সদস্যদের টোপে ফেলে হত্যা করে। একই মাসের শেষদিকে দাগান আর তার লোকেরা ইউনিফর্ম পরে দুটো জিপগাড়িতে করে ফিলিস্তিনিদের জাবালিয়া শরণার্থী ক্যাম্পের দিকে আগাতে থাকে। পথে এক ট্যাক্সিকে ক্রস করছিল তাদের জিপ, এমন সময় দাগান সেই ট্যাক্সির একজনকে চিনে ফেলেন। আবু নিমার, ফিলিস্তিনি যোদ্ধা হিসেবে ইসরাইলের টপ শত্রুদের একজন। সাথে সাথে জিপ থামাতে বললেন দাগান। আবু নিমারও বুঝে ফেললেন কী হতে চলেছে, যখন তার ট্যাক্সিক্যাব ঘিরে ফেরা হলো। আবু নিমার বেরিয়ে এলেন, হাতে গ্রেনেড। দাগানের দিকে ফিরে গ্রেনেডের পিন খুলে ফেললেন।

"গ্রেনেড!" বলেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন দাগান। অন্যদিকে নয়, আবু নিমারের দিকে। কথিত আছে, আবু নিমারকে শুইয়ে ফেলার পর দাগান গ্রেনেড কেড়ে নিয়ে অন্যদিকে ছুঁড়ে দেন। এরপর খালি হাতে খুন করেন আবু নিমারকে। এ ঘটনার জন্য তাকে সাহসী পদক দেয়া হয়।

ইসরাইলের চোখে দাগান আর শ্যারন যা করেছেন, তা ছিল খুবই সুফলদায়ক। গাজা থেকে তাদের এ ইউনিট বিশাল সংখ্যার ফিলিস্তিনি যোদ্ধাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। অনেক বছর এ এলাকায় ইসরাইল আর কোনো ঝামেলাই পোহায়নি তাদের দিক থেকে। শ্যারন বলতেন, দাগানের নৈপুণ্য হলো আরবদের শরীর থেকে মাথা আলাদা করে ফেলায়।

তবে সত্যিকারের দাগানকে কম লোকেই চিনত। তার আসল নাম মেইর দাগান (מאיר דגן) নয়, বরং মেইর হুবারম্যান। জন্ম ১৯৪৫ সালে ইউক্রেনের এক ট্রেনের বগিতে। তার পরিবার তখন হলোকস্ট থেকে বাঁচতে পোল্যান্ড থেকে পালিয়ে সাইবেরিয়া চলে যাচ্ছে। পরিবারের বেশিরভাগই মারা গিয়েছেন হলোকস্টে। দাগান ইসরাইলে আলিয়াহ করে চলে এলেন, বড় হন তেলআবিব শহর থেকে পনের মাইল দক্ষিণে লোদ নামের এক পুরাতন আরব শহরে, জায়গাটা ছিল গরিবদের। খুব কম মানুষই জানত মেইর দাগান ইতিহাসের বই পড়তে, ক্লাসিকাল মিউজিক শুনতে আর পেইন্টিং-ভাস্কর্য পছন্দ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিরামিষাশী।

তবে ছোটবেলা থেকে পরিবারের হলোকস্টের স্মৃতি তাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। এজন্য ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতি তার প্রচণ্ড আবেগ। প্রত্যেকবার নতুন অফিস রুম হলেই তিনি প্রথমে রুমে বুড়ো এক ইহুদী লোকের ছবি টানাতেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বুড়ো হাঁটু গেড়ে আছেন দুজন নাৎজি এসএস (৮৮) অফিসারের সামনে, গায়ে প্রার্থনার শাল জড়ানো। অফিসারদের একজনের হাতে বন্দুক, আরেকজনের হাতে পেটানোর ব্যাট। দাগান সবাইকে বলতেন, "এই বুড়ো লোকটা আমার দাদা। আমি ওনার দিকে যতবার তাকাই, ততবার অনুভব করি হলোকস্টের স্মৃতি, অনুভব করি আমাদের কতটা শক্তিশালী হতে হবে, যেন আর কোনোদিন হলোকস্টের মতো ঘটনা না ঘটে আমাদের সাথে।" ছবিটি যখন তোলা হয়েছিল, তার কয়েক সেকেন্ড পর হত্যা করা হয় তাকে। দাগানের দাদার নাম ছিল বার এরলিখ সুশনি।

এই সেই ছবি, দাগানের দাদা হাঁটু গেড়ে বসে আছেন, মৃত্যুর আগ মুহূর্তে

১৯৭৩ সালে আরব দেশগুলোর সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ শুরু হয়, যার নাম ছিল 'রামাদান যুদ্ধ' বা ইহুদীদের 'ইয়ম কিপুর' যুদ্ধ। এই আরব-ইসরাইলি যুদ্ধে যে ইসরাইলি যোদ্ধারা সুয়েজ ক্যানেল পেরিয়ে যোগ দেয়, তাদের প্রথম দিককার যোদ্ধাদের একজন ছিলেন এই দাগান।

১৯৮২ সালে লেবাননের সাথে যুদ্ধে তিনি তার ব্রিগেডের প্রধান হয়ে বৈরুতে প্রবেশ করেন। নিজের নৈপুণ্যে তিনি খুব দ্রুতই দক্ষিণ লেবানন নিরাপত্তা জোনের কমান্ডার হন। সেই আগেরকার গাজার দিনগুলোর মতো অপারেশন শুরু করেন তিনি। সেনারা তাকে ডাকা শুরু করলো 'কিং অফ শ্যাডোজ'। লেবানন যুদ্ধ শেষেও

তার এই গোপন অভিযানগুলো চলতে থাকে। শেষমেশ ১৯৮৪ সালে আরব সেজে এসব কাজ-কারবার করার দায়ে তাকে তিরস্কার করেন ইসরাইলের চিফ অফ স্টাফ মোশে লেভি।

ইসরাইলের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রথম সংঘবদ্ধ বিপ্লব বা 'ইন্তিফাদা'হয় ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত। এ সময় তৎকালীন ইসরাইলি চিফ অফ স্টাফ এহুদ বারাকের একজন উপদেষ্টা হিসেবে তাকে পশ্চিম তীরে বদলি করা হয়। তিন বছর আগে পাওয়া তিরস্কারকে থোড়াই কেয়ার করে দাগান আবার আগের মতো গোপন অভিযান শুরু করেন, এমনকি এহুদ বারাককে পর্যন্ত রাজি করিয়ে ফেলেন তার সাথে যোগ দিতে। তারা দুজনে ফিলিস্তিনি কাপড়-চোপড় পরে নীল রঙের একটি মার্সিডিস গাড়িতে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন ইসরাইলিদের জন্য বিপজ্জনক নাবলুস কাসবাহ এলাকায়। অভিযান শেষে দুজন যখন ফিরলেন মিলিটারি হেডকোয়ার্টারে, সেন্ট্রির দায়িত্বে থাকা লোকদের একেবারে পিলে চমকে গেল, স্বয়ং এহুদ বারাক ফিরছেন এ অভিযান থেকে?

১৯৯৫ সালে দাগান ছিলেন মেজর জেনারেল পদে। এ সময় তিনি সামরিক বাহিনী ত্যাগ করে বন্ধুর সাথে যোগ দিলেন আঠারো মাসের এক বাইক টুরে, এশিয়া ঘুরবেন। কিন্তু সেটা তার ভাগ্যে ছিল না। হঠাৎ খবর এলো, প্রধানমন্ত্রী ইৎসহাক রাবিনকে খুন করা হয়েছে, তাকে ফিরে আসতে হবে।

গুপ্তহত্যায় নিহত প্রধানমন্ত্রী ইৎসহাক রাবিনকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে সমাহিত করা হচ্ছে (৬ নভেম্বর, ১৯৯৫)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসরাইলে ফেরত আসার পর, কিছুদিন কাজকর্ম করার পর তিনি লিকুদ পার্টির হয়ে আরিয়েল শ্যারনকে জেতাতে ক্যাম্পেইনে যোগ দিলেন। তারপর, ২০০২ সালে তিনি সমস্ত কাজ কর্ম থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের বাসায় ফিরে আসেন গালিলিতে। ফিরে দেখেন, তার বাচ্চারা এত বড় হয়ে গেছে, তিনি তাদেরকে সময়ই দিতে পারেননি।

এ অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণনা করা গাজার সেই ঘটনার পর কেটে গিয়েছে তিরিশটি বছর। দাগান একদিন ফোনকল পেলেন প্রধানমন্ত্রী আরিয়েল শ্যারনের কাছ থেকে। সাতান্ন বছরের বন্ধুকে শ্যারন অনুরোধ করলেন, "আমি তোমাকে মোসাদের প্রধান হিসেবে চাই। আমার এমন একজনকে মোসাদের মাথা হিসেবে দরকার, যার বুকের পাটা আছে তোমার মতো।"

২০০২ সালে মোসাদের খরা চলছে তখন। বেশ কয়েক বছর ধরে ব্যর্থ সব অপারেশন চালিয়ে সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে গেছে। জর্ডানের রাজধানী আম্মানে হামাসের নেতাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হওয়া, সুইজারল্যান্ড, সাইপ্রাস আর নিউজিল্যান্ডে ইসরাইলি এজেন্টদের ধরা পড়া— সব মিলিয়ে মোসাদের নাম, সম্মান সব তলানিতে ঠেকেছে তখন। আগের মোসাদ-প্রধান ছিলেন এফ্রাইম হালেভি, জুতের ছিলেন না তিনি তেমন। হালেভি আগে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ইসরাইলের রাষ্ট্রদূত ছিলেন, থাকতেন বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে। কূটনীতিক হিসেবে তিনি চমৎকার, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যোদ্ধা বা নেতা হিসেবে ভালো ছিলেন না। শ্যারন তাই চাইছিলেন দাগানের মতো কাউকে মোসাদকে টাইট দিতে।

নবম মোসাদ-প্রধান এফ্রাইম হালেভি

তবে মোসাদের লোকেরা দাগানকে ভালোভাবে নিলো না। তিনি গোয়েন্দাগিরির ট্রেনিং নেননি, এসেছেন বাইরে থেকে। তাদের সাথে মিলছে না একদমই। প্রতিবাদস্বরূপ মোসাদের সিনিয়র কয়েকজন অফিসার পদত্যাগ করলেন। তবে দাগানের তাতে কিছুই আসে যায় না। তিনি তার মতো করে ইউনিট আর অপারেশন লো সাজাতে লাগলেন। ২০০৬ সালে যখন আবারও লেবাননের সাথে যুদ্ধ লাগলো, তখন তিনি আকাশ আক্রমণের বিরুদ্ধে মত দেন। তার মতে, স্থলপথে আক্রমণই শ্রেয়। তার পরিকল্পনা ভালোই চলল, তবে প্রাক্তন মোসাদ অফিসারদের বরাতে পত্রিকায় তার সমালোচনা আটকে রইলো না।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, একদিন হঠাৎ করে পত্রিকাগুলোর শিরোনাম বদলে গেল, এবার তার নামে তেল দেয়া সব খবর আসতে লাগলো— "দাগান: যে মানুষটি ঘটালো মোসাদের পুনরুত্থান"।

দাগানের নেতৃত্বে কঠিন সব মিশন হাতে নেয় মোসাদ। হিজবুল্লাহ'র নেতা ইমাদ মুঘনিয়েকে দামেস্কে হত্যা করে দাগানের দল। সিরিয়ার নিউক্লিয়ার চুল্লি ধ্বংস করার জন্যও তিনিই দায়ী। সেই সাথে আছে ইরানের গোপন নিউক্লিয়ার ক্যাম্পেইনের বিরুদ্ধে দাগানের নেতৃত্বে মোসাদের গোপন অভিযান।

নেতানিয়াহুর সাথে দাগান

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মোসাদের ডিরেক্টর পদে ২০০৮ সাল পর্যন্ত দাগানের থাকার ব্যবস্থা করে যান প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট। ২০০৮ চলে এলে তিনি সেটি ২০০৯ সাল পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। এরপর ২০০৯ সালে, প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু তাকে পুনরায় একই পদে নিয়োগ দেন, এবার মেয়াদ ২০১০ সাল পর্যন্ত। সে বছর জুন মাসে ইসরাইলের একটি চ্যানেল রিপোর্ট করে, বেনজামিন নাকি দেখা করছেন না দাগানের সাথে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে সেটি অস্বীকার করা হয়, ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে তাকে সরিয়ে তামির পারদো নতুন ডিরেক্টর হন মোসাদের। ডিরেক্টর পদ ছাড়ার পর দাগান ইরানের নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটিতে ইসরাইলের আক্রমণকে বোকামি বলে আখ্যা দেন।

২০১২ সালে দাগানের লিভার ক্যান্সার ধরা পড়ে। তিনি কেমোথেরাপি নেয়া শুরু করেন, তবে তার আগেই তার লিভার ফেইল করা শুরু করে। তিনি লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করলেও ক্যান্সার তার পিছু ছাড়েনি।

বুড়ো বয়সে দাগান

২০১৬ সালের ১৭ মার্চ তিনি ৭১ বছর বয়সে মারা যান। তার মারা যাবার পর নেতানিয়াহু বলেন, "এক মহান যোদ্ধার মৃত্যু হলো। যে আট বছর তিনি মোসাদকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই দিনগুলো চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।" ইহুদী জাতির প্রতি তার আত্মোৎসর্গের জন্য ইসরাইলে তিনি জাতীয় বীরের সম্মান পান।

এ বই লিখবার মুহূর্তে, ২০২১ সালের শুরুতে মোসাদের ডিরেক্টর পদে আছেন ৫৯ বছর বয়সী ইয়োসেফ 'ইয়োসি' কোহেন। তিনি ২০১৬ সাল থেকে এ পদে আছেন।

ইয়োসি কোহেন, মোসাদের বর্তমান (২০২১) ডিরেক্টর

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধ্যায়-৪

তেহরানে তাণ্ডব

২০১১ সালের ২৩ জুলাই। বিকেল সাড়ে চারটা বাজে।

জায়গাটা দক্ষিণ তেহরানের বনি হাশেম সড়ক।

বাইকে চড়া দুজন বন্দুকধারী তাদের লেদার জ্যাকেটের আড়াল থেকে অটোমেটিক অস্ত্র বের করে আনলো, আর সাথে সাথেই গুলি চালিয়ে দিল এক লোকের দিকে। লোকটি সবেমাত্র তার বাসায় ঢুকছেন। কিন্তু ঢোকা আর হলো না। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

হত্যা সেরেই কেটে পড়লো দুজন, পুলিশ আসলো বহুক্ষণ বাদে। নিহতের নাম দারিয়োশ রেজাইনেজাদ। বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ। পেশায় একজন পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসর তিনি, ইরানের গোপন পারমাণবিক অস্ত্র প্রোগ্রামের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডের বৈদ্যুতিক সুইচ বানানোর কাজে ছিলেন।

দারিয়োশ রেজাইনেজাদ

রেজাইনেজাদই একমাত্র ইরানি বিজ্ঞানী নন যাকে প্রাণ হারাতে হয়!

ইসরাইলের রিপোর্ট দাবি করছে, ইরান ওপরে ওপরে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যেই পারমাণবিক প্রযুক্তি নির্মাণ করছে, এর প্রমাণও তারা দিয়েছে— রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে তারা বিদ্যুৎ শক্তির গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বানিয়েছে বুশেহর চুল্লী। চমৎকার উদ্যোগ বটে। কিন্তু ইসরাইলের রিপোর্ট এটাও বলছে, ইরানের আরও কিছু গোপন পারমাণবিক চুল্লী রয়েছে, সেগুলোর আছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা—বাইরের লোকের বোঝার উপায়ই নেই ভেতরে কী চলে। একটা সময় ইরান স্বীকার করে এ চুল্লীগুলোর অস্তিত্ব, কিন্তু এটা কখনই বলেনি যে তারা অস্ত্র বানাচ্ছে। কিন্তু ততদিনে বিভিন্ন দেশের সিক্রেট সার্ভিস ইরানের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নাম ফাঁস করে দিয়েছে, তাদের নামে অভিযোগ— তারা ইরানের প্রথম নিউক্লিয়ার বোমা বানানোতে সাহায্য করছেন। সাথে সাথে মোসাদ নেমে পড়লো ইরানের এ পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিতে।

২০১০ সালের ২৯ নভেম্বর। ঘড়িতে বাজে সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশ। উত্তর তেহরানের রাস্তায় ইরানের নিউক্লিয়ার প্রোজেক্টের প্রধান ডক্টর মজিদ শাহরিয়ারির গাড়ির পেছন থেকে বেরিয়ে এলো একটি মোটরবাইক। বাইকচালক গাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় গাড়ির গায়ে একটি ডিভাইস লাগিয়ে দিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো সেই ডিভাইস, মারা গেলেন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী পদার্থবিদ শাহরিয়ারি। আহত হলেন তার স্ত্রী।

ডক্টর মজিদ শাহরিয়ারি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঠিক একই সময়ে দক্ষিণ তেহরানেও একইরকম এক ঘটনা ঘটে গেল। গুরুত্বপূর্ণ পদধারী একজন নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী ডক্টর ফারিদুন আব্বাসি-দাওয়ানির প্যাজো-২০৬ গাড়ির ক্ষেত্রেও একই কাজ করল আরেক বাইকচালক। তবে এবার কেউই মারা গেলেন না। ডক্টর আব্বাসি-দাওয়ানি আর তার স্ত্রী দুজনেই আহত হলেন ঠিকই, কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলেন।

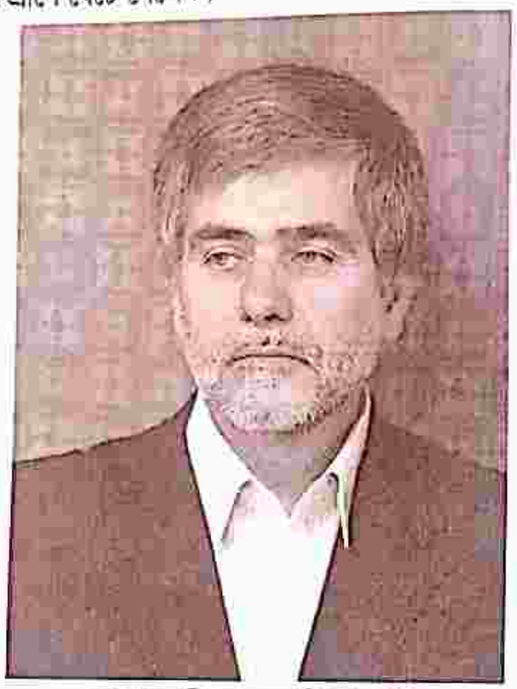

ডক্টর ফারিদুন আব্বাসি-দাওয়ানি

ইরান সরকারের বুঝতে কোনো কষ্টই হলো না কাজগুলো কাদের করা, প্রায় সাথে সাথেই তারা অভিযোগের তীর ছুঁড়ে দিল মোসাদের দিকে। এ দুজন বিজ্ঞানী কী কী করতেন, সেগুলো সরকার চেপে গেলো ঠিকই, কিন্তু সেই প্রোজেক্টের প্রধান আলী আকবর সালেহি ঘোষণা করলেন, বিজ্ঞানী শাহরিয়ারি শহীদ হয়েছেন, তার দল এক মূল্যবান রত্নকে হারিয়েছে।

ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্টও তাদের দুজনের জন্য গভীর সমবেদনা জানালেন। একজনের জন্য অবশ্য বেশিই অনুরাগ প্রদর্শন করলেন তিনি, আব্বাসি-দাওয়ানি সুস্থ হবার সাথে সাথে তাকে ইরানের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিলেন। তবে তাদেরকে যারা আক্রমণ করেছিলো তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

তবে মৃত্যুর মিছিল কিন্তু এখানেই শেষ নয়!

২০১০ সালের জানুয়ারির ১২ তারিখ সকাল সাতটা বেজে পঞ্চাশ মিনিটে প্রফেসর মাসুদ আলী মোহাম্মাদী তার বাসা থেকে বেরিয়ে এলেন। জায়গাটা উত্তর তেহরানের শরিয়াতি সড়কে। প্রফেসর মাসুদ তখন যাচ্ছেন তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিফ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি। যেই না তিনি গাড়ির দরজা খুললেন, সাথে সাথেই বিকট বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো এলাকাটি। তদন্তকারী আর পুলিশ বাহিনী যতক্ষণে বিস্ফোরণের জায়গায় পৌঁছালেন, ততক্ষণে প্রফেসরের মাসুদের শরীর আস্ত নেই, চেনার উপায় নেই তার গাড়িও। গাড়ির পাশে একটি মোটরবাইক রাখা ছিল, এর সাথেই আটকানো ছিল একটি বোমা। ইরানি গণমাধ্যম জানালো, এ গুপ্তহত্যা মোসাদের এজেন্টদের করা। প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদও একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।

মাসুদ আলী মোহাম্মদীর বিধ্বস্ত গাড়ি, ইনসেটে তার মৃত্যুর আগের ছবি

পঞ্চাশ বছর বয়সী প্রফেসর মাসুদ কোয়ান্টাম ফিজিক্সের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন, একই সাথে ছিলেন ইরানি পারমাণবিক অস্ত্র প্রোগ্রামের একজন উপদেষ্টা। তিনি ইরানের ইসলামি তন্ত্র প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত রেভলুশনারি গার্ডসের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একজন সদস্য ছিলেন বলে রিপোর্ট করে ইউরোপীয় মিডিয়াগুলো। কিন্তু তার মৃত্যুর মতো জীবনের অনেকটা অংশই ছিল রহস্যময়। তার বন্ধুরা জানালেন, তিনি কোনো সামরিক প্রোজেক্টের সাথে জড়িতই ছিলেন না, সবই ছিল তাত্ত্বিক। তারা এও বললেন যে, তিনি সরকারিবিরোধী প্রতিবাদগুলোতেও অংশ নিতেন।

কিন্তু তার জানাজার সময় দেখা গেল সরকারপন্থী রেভলশুনারি গার্ডরা হাজির, তারাই তার কফিন বহন করল। বিভিন্ন সূত্রে এটিই বেরিয়ে আসতে লাগলো যে, তিনি সত্যি সত্যিই ইরানের পারমাণবিক প্রোজেক্টের উপদেষ্টা ছিলেন।

২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে মোসাদের এজেন্টদের হাতে খুন হন ড. আরদাশির হোসাইনপুর, এ হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছিল তেজস্ক্রিয় বিষ। অবশ্য ইরান অস্বীকার করে এ অভিযোগ, বলে, এ ঘটনার সাথে মোসাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ইরানের ভেতরে নাকি মোসাদের অপারেশন করার কোনো ক্ষমতাই নেই। তাদের অফিশিয়াল বক্তব্য হলো, প্রফেসর হোসাইনপুর তার নিজের বাসার ধোঁয়া নাকে-মুখে গিয়ে মারা যান দুর্ঘটনাবশত। ইরান সরকার এটিও নিশ্চিত করে যে, চুয়াল্লিশ বছর বয়সী প্রফেসর হোসাইনপুর ইরানের কোনো পারমাণবিক প্রোজেক্টের সাথে জড়িত ছিলেন না, ছিলেন কেবল এক তাড়িৎচৌম্বক বিশেষজ্ঞ।

ড. আরদাশির হোসাইনপুর

পরে জানা গেল, প্রফেসর হোসাইনপুর কাজ করতেন ইসফাহানের এক গোপন স্থাপনায়, সেখানে ইউরেনিয়ামকে গ্যাসে পরিণত করা হয়। আর সে গ্যাস ব্যবহার হতো পারমাণবিক প্রকল্পে। এর আগের বছর, ২০০৬ সালে, প্রফেসর হোসাইনপুরকে সর্বোচ্চ সরকারি পুরস্কার দেয়া হয় বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অবদান রাখবার জন্য। তারও আগের বছর ইরানের মিলিটারি পদক পেয়েছিলেন তিনি।

ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের হত্যা করা বড় এক যুদ্ধের একটিমাত্র অংশ ছিল মোসাদের। লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ রিপোর্ট করে, দাগানের মোসাদ বছরের পর বছর ধরে ডাবল এজেন্টদের নিয়োগ করে গিয়েছে ইরানের পারমাণবিক শক্তি ক্ষীণ করার লক্ষ্যে। মোসাদ চায়, যতদিন সম্ভব ইরানের পারমাণবিক বোমা বানানো দেরি করিয়ে দিতে হবে। যতদিন ইরানের পারমাণবিক বোমা নেই, ততদিন ইসরাইলের শান্তি। ইরানের প্রেসিডেন্ট আহমেদিনিজাদ ইসরাইলকে ভয়াবহ শত্রুজ্ঞান করতেন।

কিন্তু মোসাদ আসলে সফল হয়নি, হাজার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা উন্মোচন করতে পারেনি ইরানের পুরো পারমাণবিক পরিকল্পনা। ইরান ঠিকই তাদের কাজ চালিয়ে গিয়েছে গোপনে, কাজে লাগিয়েছে অনেক বিজ্ঞানীকে, ঢেলেছে অনেক টাকা। বোকা বানিয়েছে মোসাদ ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাদের।

ইরানের শাহ রেজা পাহলভি দুটো নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর বানাবার কাজ শুরু করেন, শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যের পাশাপাশি সামরিক লক্ষ্যও ছিল এর পেছনে। এ কাজ শুরু হয় সত্তরের দশকে, কিন্তু এতে ইসরাইলের কোনো টনক তখনও নড়েনি। নড়বেই বা কেন! তখন তো ইরান ইসরাইলের মিত্র। ১৯৭৭ সালে ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল ওয়াইজম্যান স্বয়ং তেলআবিবে বসে বৈঠক করেন ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল হাসান তুফানিয়ানের সাথে। মিত্র অবস্থায় ইরানকে ইসরাইল আধুনিক সামরিক যন্ত্রপাতিও দিয়েছিল। ইসরাইল সেই বৈঠকের যে রেকর্ড রেখেছিল, সে অনুযায়ী, ইসরাইল ইরানকে অত্যাধুনিক মিসাইল অফার করেছিল। তুফানিয়ান এটা জেনে চমৎকৃত হন যে, ইসরাইলের মিসাইলগুলো পারমাণবিক ওয়ারহেড বহন করতে পারবে। কিন্তু ইরান এ তথ্য নিয়ে কিছু করার আগেই দেশের মাটিতে ইরানি বিপ্লব হয়ে গেল। বদলে গেল ইরান। শাহ পাহলভি পালিয়ে গেলেন, দেশের ক্ষমতা চলে এলো আয়াতুল্লাহ খোমেনির হাতে। তার নাম মূলত রুহুল্লাহ খোমেনি, কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে তিনি আয়াতুল্লাহ খোমেনি নামে পরিচিত হন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

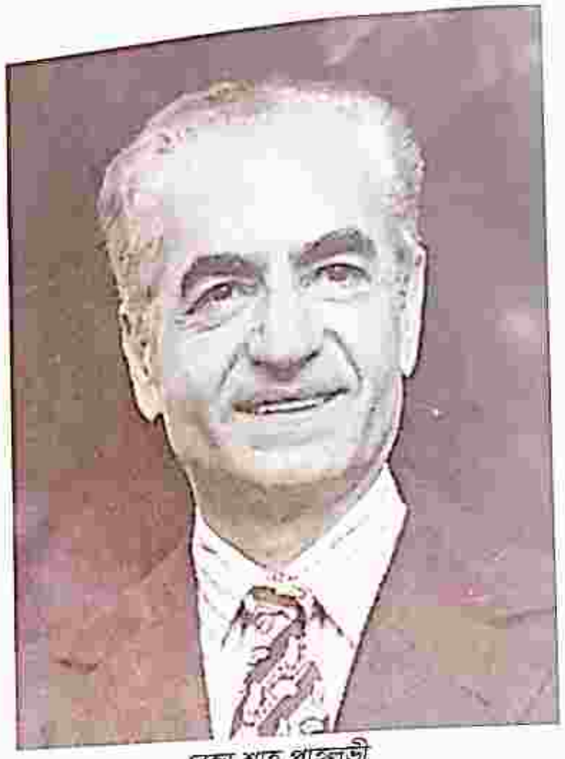

রেজা শাহ পাহলভী

খোমেনি সাথে সাথেই নিউক্লিয়ার প্রোজেক্টের ইতি টানেন। তার কাছে মনে হয়েছিল এগুলো ইসলামবিরোধী। রিয়্যাক্টরগুলোর নির্মাণ থামিয়ে দেয়া হয়। আশির দশকে ইরাকের সাথে তুমুল যুদ্ধ লেগে যায় ইরানের। ইরানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করেন সাদ্দাম হুসাইন। এরকম অস্ত্রের প্রয়োগ দেখতে পেয়ে আয়াতুল্লাহ সরকারের টনক নড়ে। তারা তো বহু পিছিয়ে আছে!

রুহুল্লাহ খোমেনি

খোমেনি মারা যাবার আগেই তার উত্তরাধিকারী আলী খামেনি সামরিক বাহিনীকে আদেশ করেন নতুন রকমের অস্ত্র তৈরি করতে, যার মাঝে পারমাণবিক অস্ত্রও ছিল, ইরাকের সাথে যুদ্ধে যেমনটির মুখোমুখি হতে হয়েছে, তা যেন আর না হতে হয়। এই ইসলাম-বিরোধী অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার ইতি টানা হয়।

আলী খামেনি

ইরান যে পারমাণবিক অস্ত্র প্রকল্প হাতে নিয়েছে আবার, সে খবর খণ্ড খণ্ড আকারে জানতে শুরু করে বিশ্ব, আর সেটা ছিল আশির দশকের মাঝামাঝিতে। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ভেঙে পড়লো, তখন ইউরোপ জুড়ে গুজব চলছে, ইরান নাকি সোভিয়েত মিলিটারির পদচ্যুত বা বেকার সাবেক কর্মকর্তাদের সহায়তায় সোভিয়েতদের বানানো নিউক্লিয়ার বোমা আর ওয়ারহেড কিনছে। নাটকীয় সব গুজব ছাপাতে লাগলো পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম, আজ এখান থেকে রাশিয়ান বিজ্ঞানী উধাও, কাল ওখান থেকে; আরও কত কী! উর্বর মস্তিষ্কের পরিকল্পনায় সাংবাদিকেরা ছাপাতে লাগলেন, ইউরোপ পাড়ি দিয়ে ট্রাকবোঝাই অস্ত্র নাকি ইরানে পৌঁছে যাচ্ছে। তেহরান, মস্কো আর বেইজিং থেকে জানা গেলো, রাশিয়ার সাথে নাকি ইরান চুক্তি করেছে বুশেহর পারমাণবিক চুল্লীর ব্যাপারে, আবার চীনের সাথেও নাকি চুক্তি হয়েছে ছোট দুটো চুল্লীর জন্য।

চিন্তায় পড়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরাইল। আর যার হাতেই পারমাণবিক অস্ত্র থাকুক না কেন, মুসলিম রাষ্ট্রের হাতে কোনোভাবেই থাকা যাবে না। ইউরোপ জুড়ে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা স্পাইদের লাগিয়ে দেয় খুঁজে বের করতে, কারা সেই বিজ্ঞানী, ইরান যাদেরকে কাজে নিয়েছে। কারা বিক্রি করেছে সোভিয়েত বোমা? টিকিটিরও দেখা পেল না কেউ। কিছু না পেয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি রাশিয়া আর চীনকে চাপ দিল এসব চুক্তি বাতিল করতে। চীন চাপে পড়ে বাতিল করেই দিল ইরানের সাথে চুক্তি। তবে রাশিয়া বুড়ো আঙুল দেখালো যুক্তরাষ্ট্রকে। যদিও তারাও দেরি করতে লাগলো তাদের চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে। বিশ বছর লাগলো চুল্লী বানিয়ে শেষ করতে, এবং সে চুল্লীর নিয়ন্ত্রণ থাকলো রাশিয়ার হাতে।

মোসাদ আর সিআইএ ধরতেও পারলো না যে এই চীন ও রাশিয়ার সাথে করা চুক্তিগুলো স্রেফ মনোযোগ অন্যদিকে নেয়ার পরিকল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। ইরান নাকানি চুবানি খাওয়ালো বিশ্বের সেরা সিক্রেট সার্ভিস মোসাদকে। গোপনে অন্যত্র চালিয়ে গেল বড় পারমাণবিক প্রকল্প।

দুবাই। ১৯৮৭ সাল।

গোপন এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে এক ছোট্ট ধুলোবালি ভরা কক্ষে। উপস্থিত আট জনের মাঝে তিনজন ইরানি, দুজন পাকিস্তানি, আর তিনজন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ, এর মাঝে দুজন জার্মান। এ তিনজন ইউরোপীয় ইরানের জন্য কাজ করছে।

ইসরাইলি তথ্য মোতাবেক, ইরান আর পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা গোপন চুক্তি করল। একটা বড় অংকের অর্থ পাকিস্তানিদেরকে পেমেন্ট করা হলো।

পাকিস্তানিদের পারমাণবিক প্রকল্পের প্রধান ড. আব্দুল কাদের খান। কয়েক বছর আগে পাকিস্তান নিজেই পারমাণবিক প্রকল্প সূচনা করেছে। প্রতিবেশী শত্রু রাষ্ট্র ভারতের নিউক্লিয়ার ক্ষমতার সমকক্ষতা অর্জন করতে হবে। পাকিস্তানের তখন দরকার পারমাণবিক বোমা নির্মাণের জন্য সরঞ্জামাদি। আব্দুল কাদের খান সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করবেন না, করবেন ইউরেনিয়াম। ইউরেনিয়াম খনিজ থেকে ইউরেনিয়াম-২৩৫ আইসোটোপের মাত্র ১% পাওয়া যায়, আর বাদবাকি ৯৯% পাওয়া যায় ইউরেনিয়াম-২৩৮ আইসোটোপ, যা কোনো কাজেই লাগে না এক্ষেত্রে। তবে অভিনব উপায়ে আব্দুল কাদের খান এই ইউরেনিয়াম

থেকে পারমাণবিক বোমা তৈরির উপাদান বের করে ফেললেন। ইসরাইলি রিপোর্ট বলে, তার ক্লায়েন্টদের মাঝে ইরানের পাশাপাশি লিবিয়া আর উত্তর কোরিয়াও ছিল।

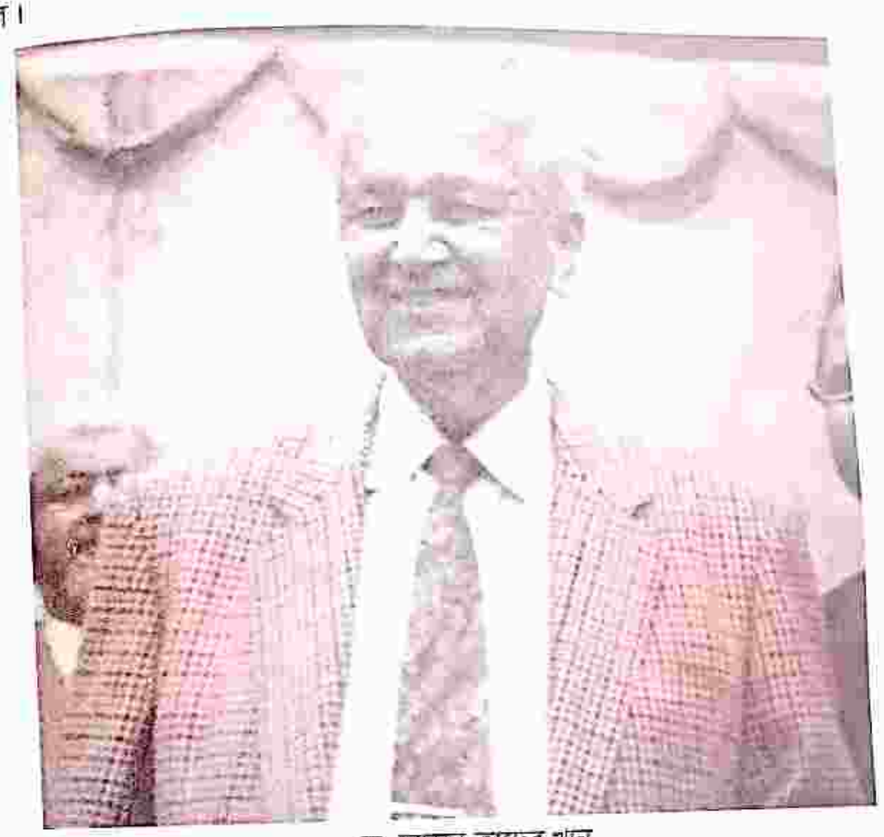

ড. আব্দুল কাদের খান

তবে ইরান কেবল পাকিস্তান থেকেই যে প্রযুক্তি নিলো, তা না; নিজেরাও নিজেদের মতো করে বানাতে লাগলো চুল্লীর সেন্ট্রিফিউজ। ইরানে বিশাল পরিমাণে ইউরেনিয়াম, সেন্ট্রিফিউজ, ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আসতে লাগলো যখন তখন। ইউরেনিয়াম নিয়ে কাজ করার জন্য বড় বড় কারখানাও তৈরি হয়ে গেল। ইরানি বিজ্ঞানীরা যেমন পাকিস্তানে গেলেন-আসলেন, তেমনি পাকিস্তানি বিশেষজ্ঞরাও ইরানে নিয়মিত আসতে লাগলেন। কিন্তু মোসাদ তখনও তা জানতে পারেনি!

ইরান বুদ্ধিমানের মতো কাজ করল, তারা এক ঝুড়িতে সব ডিম রাখার ঝুঁকি নেয়নি। একটি নির্দিষ্ট স্থানে পারমাণবিক প্রকল্পকে সীমিত না রেখে, সারা দেশ জুড়ে জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে দিল। কোনোটা সামরিক বেজে, কোনোটা ল্যাবের ছদ্মবেশে, আবার কোনোটা দূর দূরান্তের কারখানায়। কিছু কিছু প্রকল্পাংশ তো

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাটির নিচে বেশ গভীরে বানানো হলো। একটা প্ল্যান্ট ইসফাহানে, আরেকটি আরাকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেন্ট্রিফিউজ প্ল্যান্ট বসানো হলো পবিত্র কুম শহর আর নাতানজে। কখনও যদি মনে হয়, কোনো প্ল্যান্টের অবস্থান ফাঁস হয়ে গিয়েছে, তাহলেই তারা চট করে অবস্থান বদলে ফেলতে পারবে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও টের পেলো না এসব।

১৯৯৮ সালের ১ জুন আমেরিকা প্রথম টের পেল ইরানের পরিকল্পনা। বলা নেই কওয়া নেই, এক পাকিস্তানি এফবিআই-এর কাছে এসে ধরনা দিলেন নিউ ইয়র্ক শহরে, বললেন তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় চান। নাম বললেন ড. ইফতিখার খান চৌধুরী। তিনি অনর্গল বলে গেলেন ইরান আর পাকিস্তানের গোপন চুক্তির আদ্যোপান্ত। কোন বৈঠকে কী আলাপ হয়েছিল না হয়েছিল, কোন কোন পাকিস্তানি বিশেষজ্ঞ ইরানি প্রোজেক্টে গিয়েছিলেন—সব বলে দিলেন তিনি।

এফবিআই সাথে সাথে বিশ্বাস করেনি। তারা তথ্যগুলো ক্রস চেক করে তাজ্জব হয়ে গেল, তারপর বিশ্বাস করল। এফবিআই সরকারকে জানালো, এই ভদ্রলোককে আশ্রয় দেয়াটা জরুরি। কিন্তু কীসের কী, আমেরিকার কর্তৃপক্ষ আশ্রয় তো দিলই না, পুরো ব্যাপারটাই ধামাচাপা দিয়ে দিল। এমনকি তখন ইসরাইলকেও জানালো না! চার বছর লাগলো আরও সকলের জানতে।

MEK-র লোগো

ইরানের আয়াতুল্লাহ সরকারের প্রধান বিরোধী সংঘ মুজাহেদিন-ই-খালক-ই-ইরান (ایران خلق مجاهدین) বা সংক্ষেপে এমইকে। তাদের লক্ষ্য বর্তমান

সরকারের পতন ঘটানো, আর নিজেদের সরকারের পত্তন করা। এই এমইকে ২০০২ সালের আগস্ট মাসে হঠাৎ ফাঁস করে দিল যে আরাক ও নাতানজ-এ দুটো নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি আছে। পরের বছরগুলোতে তারা একের পর এক তথ্য ফাঁস করতেই থাকলো। এর মাঝে কিছু তথ্য যে বাইরের দেশ থেকে আসছে, তা বোঝাই গেল। সিআইএ-র বিশ্বাস, মোসাদ আর ব্রিটিশ এমআইসিক্স নির্ঘাত এমইকে অর্থাৎ মুজাহেদিন গ্রুপকে ভুল তথ্য দিয়ে আসছে, আর সেগুলোই তারা ফাঁস করছে।

ইসরাইলি সূত্র মতে, এক মোসাদ অফিসার নাতানজের মরুভূমিতে বিশাল সেন্ট্রিফিউজ প্ল্যান্ট আবিষ্কার করে। সেবছরই ইরানের অন্ধকার দুনিয়া থেকে একটি ল্যাপটপ এসে হাজির হয় সিআইএ-র কাছে, সেই ল্যাপটপে নানা নথিপত্র ঠাসা। আবারও সিআইএ ধারণা করল, এসব তথ্য নিশ্চিত মোসাদ এমইকে-কে দিয়েছে, তারা সেগুলো ল্যাপটপে ঢুকিয়ে পাঠিয়েছে তাদের কাছে।

কিন্তু ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ড. আব্দুল কাদের খান পাকিস্তানি চ্যানেলের পর্দায় এসে বিশ্বকে অশ্রুভরা চোখে জানালেন, তিনি লিবিয়া, উত্তর কোরিয়া আর ইরানের কাছে সেন্ট্রিফিউজ বিক্রি করেছেন। পাকিস্তানি সরকার দ্রুত তাকে ক্ষমা করে দিল।

ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প নিয়ে নানা তথ্যের জন্য প্রধান উৎস এবার হয়ে দাঁড়ালো ইসরাইল, তারাই প্রথম সেন্ট্রিফিউজ প্রকল্প আবিষ্কার করেছে যেহেতু। দাগান আর তার মোসাদ যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে কুম শহরের ফ্যাসিলিটিগুলো নিয়ে তথ্য দিতে লাগল। মোসাদ ইরানের রেভলুশনারি গার্ডের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে হাত করে ফেলে, একই কাজ করে পারমাণবিক প্রকল্পের ক্ষেত্রেও। নানা দেশকে মোসাদ তথ্য দেয়, যেন তারা ইরানগামী জাহাজগুলোকে মাঝপথে বাধা দিতে পারে, যে জাহাজগুলোতে প্রকল্পের জন্য যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম আসছিল ইরানে।

কিন্তু শুধু তথ্য যোগাড় করে ইসরাইল থামাতে পারছে না ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প। এবারে মোসাদ তাই একদম কোমর বেঁধে নেমে পড়লো। ১৬ বছর কিছু না করে থাকলেও দাগানের উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়লো মোসাদ।

২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে মধ্য ইরানে এক বিমান দুর্ঘটনা ঘটল। বিমানের সকল যাত্রী নিহত হলেন। এর মাঝে ছিলেন রেভলুশনারি গার্ডের উচ্চপদস্থ অনেক কর্মকর্তা, এমনকি তাদের একজন কমান্ডার আহমেদ কাজামিও ছিলেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইরানি মিডিয়া জানালো, খারাপ আবহাওয়া জনিত কারণে এ ক্র্যাশটা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের শীর্ষ জিওপলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম নামে পরিচিত 'স্ট্র্যাটফর' জোর গলায় ইঙ্গিত করল, এটা নিশ্চিত পশ্চিমা এজেন্টদের কাজ।

ঠিক তার এক মাস আগে, তেহরানের এক আবাসিক দালানে ক্র্যাশ করে ইরানের সামরিক কার্গো বিমান। চুরানব্বই জন যাত্রীর সকলেই মারা যান। এর মাঝে অনেকেই ছিলেন রেভল্যুশনারি গার্ডের অফিসার, আর সরকারপন্থী বেশ ক'জন নামকরা সাংবাদিক।

২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে, তেহরান থেকে উড্ডয়নের সময়ই ক্র্যাশ করে আরেকটি সামরিক বিমান। ৩৬ জন রেভল্যুশনারি গার্ড সেখানেই মারা যান। জাতীয় রেডিও চ্যানেলে, ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ঘোষণা করলেন অবশেষে, "আমরা জানতে পেরেছি, এ বিমান দুর্ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী আমেরিকান, ব্রিটিশ ও ইসরাইলের চরেরা।"

দাগানকে ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করল ইসরাইল, ইরান-বিরোধী স্ট্র্যাটেজি বানানোতে তিনি একদম ওস্তাদ। তবে দাগানের মতে গুপ্তহত্যা হওয়া উচিৎ একদম শেষ খেল। সেই শেষ খেলের সময় এসে গেছে।

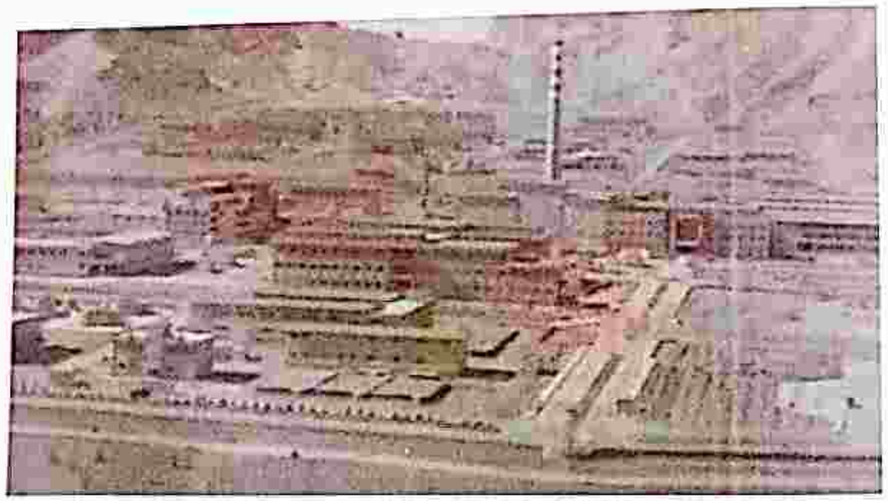

ইরানের নাতানজ নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি

২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে মোসাদ তাদের তীব্রতা বাড়িয়ে দিল। আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে খবর এলো, দিয়ালেমের নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটিতে বিস্ফোরণ হয়েছে, অজ্ঞাত স্থান থেকে সেখানে নিক্ষেপ করা হয়েছে মিসাইল। একই মাসে বুশেহরের কাছে রাশিয়ানদের বানানো নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরের পাইপলাইনে বিস্ফোরণ হলো। তেহরানের কাছের পারচিনের পরীক্ষণ সাইটেও আক্রমণ হলো। এ আক্রমণে গোপন ল্যাবগুলোর বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হয়।

২০০৬ সালের এপ্রিলে নাতানজের ফ্যাসিলিটিতে সবাই জড়ো হয়েছেন হাজার হাজার সেন্ট্রিফিউজের সামনে, নতুন এক সিরিজ সেন্ট্রিফিউজ চালানো হবে। যেই না সুইচ টেপা হলো, সাথে সাথে বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো পুরো ফ্যাসিলিটি। কেউ মারা গেল না অবশ্য। রেগেমেগে পারমাণবিক প্রকল্পের প্রধান তদন্তের নির্দেশ দিলেন। জানা গেল, কে বা কারা যেন ভুয়া পার্টস বসিয়ে রেখে গেছে প্ল্যান্টের নানা জায়গায়। সিবিএস চ্যানেল খবরে জানায়, মোসাদ আমেরিকান এজেন্টদেরকে সাহায্য করেছিল সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রগুলোতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফোরক বসাবার কাজে।

২০০৭ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ একটি গোপন অর্ডারে সাইন করে দেন, যাতে সিআইএ-কে অনুমতি দেয়া হয় ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প বাস্তবায়ন দেরি করাতে যা যা করা দরকার, তা করতে। অন্যান্য পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও একই পথে হাঁটলো। আগস্ট মাসে, দাগান ইরান নিয়ে পরিকল্পনা ঠিক করতে মার্কিন প্রতিনিধির সাথে বসলেন।

ইরানের ফ্যাসিলিটিগুলোতে একের পর এক বিস্ফোরণ হয়েই চলল। বুশেহরের বিস্ফোরণের কারণে বাস্তবায়ন পিছিয়ে যায় দুই বছর! আরাক আর ইসফাহানও বাদ গেল না আক্রমণ থেকে।

টাইম ম্যাগাজিন জানালো আরেক খবর। ২০০৯ সালের ২৪ জুলাই ফিনল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করে 'আর্কটিক সি' নামের জাহাজ। রাশিয়ান ক্রু নিয়ে জাহাজটি যাচ্ছে আলজেরিয়াতে। ভেতরে নাকি কাঠ বোঝাই। দু'দিন বাদে আট জন দস্যু এসে হাইজ্যাক করে জাহাজটিকে। এক মাস পর রাশিয়ানরা স্বীকার করল যে রাশিয়ার কমান্ডো টিম এ কাজটি করেছে। টাইমস আর ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকা জানায়, মোসাদই নাকি রাশিয়ানদের জানিয়ে দেয় যে, ইরানিরা এক রাশিয়ান প্রাক্তন অফিসারের কাছ থেকে এই জাহাজ বোঝাই ইউরোনিয়াম কিনে নিয়েছে। তবে টাইম ম্যাগাজিন বলছে ভিন্ন কথা। রাশিয়ান কমান্ডো দল নয়, মোসাদই সরাসরি এই হাইজ্যাক কর্মটি করেছিল।

তবে এতসব আক্রমণের পরেও ইরান বসে থাকেনি, তারা গোপনে কুম শহরের কাছে আরেকটি গোপন ফ্যাসিলিটি বানিয়ে ফেলে। কিন্তু কয়েক বছর বাদে ২০০৯ সালে এসে ইরান জানতে পারে তাদের এ পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন আর ইসরাইল জেনে গেছে। সাথে সাথে তেহরান সরকারিভাবে জানিয়ে দিল যে, কুমের কাছে তারা একটি ফ্যাসিলিটি নির্মাণ করছে। এই ঘোষণার আগে ইরানিরা কুম শহরের ফ্যাসিলিটি নিয়ে নানা তথ্য পাচার করতে যাওয়া এক এমআইসিক্স এজেন্টকে ধরে ফেলে। এক মাস পর সিআইএ ডিরেক্টর লিওন প্যানেটা টাইম

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ম্যাগাজিনকে জানান, সিআইএ তিন বছর ধরেই এ পরিকল্পনা জানত, মোসাদের কারণেই তারা এ তথ্য জানতে পেরেছিল।

'আর্কটিক সি' জাহাজ

ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থার মতে, মোসাদ, এমআইসিক্স আর সিআইএ— এ তিনটি সংস্থা এ ইরান মিশনে একসাথে কাজ করতে থাকে; মোসাদ মূলত মাঠপর্যায়ের কাজগুলো করে, বাদবাকি সাহায্য করে এমআইসিক্স আর সিআইএ। আর এ সম্মিলিত কাজের পেছনে হোতা হলেন দাগান, মোসাদের প্রধান। তিনিই বলেন, এই প্রতিযোগিতার খেলা না খেলে সবার একসাথে একদলে খেলা দরকার।

২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে, প্রাক্তন ইরানি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল আলী রেজা আসগরি ইস্তাম্বুল যাচ্ছিলেন। তিনি পারমাণবিক প্রকল্পে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। ইস্তাবুল গিয়ে তিনি হারিয়ে যান, সারা বিশ্বে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ইরান তার দেখা পায়নি। চার বছর পর ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আলী আকবর সালেহি জাতিসংঘকে জানান, মোসাদ জেনারেল আসগরিকে অপহরণ করে ইসরাইলের জেলে বন্দী করে রেখেছে। তবে সানডে টেলিগ্রাফ জানায়, আসগরি আসলে ইস্তাম্বুলে মোসাদের কাছে সবকিছু বলে দিয়েছে। হয় মোসাদ তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে; নাহয় সিআইএ এমনটি করেছে।

জেনারেল আলী রেজা আসগরি

এরকম একের পর এক লোক উধাও হতেই থাকলো। তবে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল একজনের বেলায়, নাম তার শাহরাম আমিরি, কাজ করতেন কুমে। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে সৌদি আরবে হজ্ব করতে গিয়ে হারিয়ে যান আমিরি। ইরান সরকার সৌদি সরকারকে চাপ দেয় ঘটনার আদ্যপান্ত বের করতে। কয়েক মাস পর আমিরি দেখা দিলেন আমেরিকায়! তিনি সিআইএ-র কাছে সমস্ত খবরাখবর বলে দিলেন, পেলেন ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, নতুন পরিচয়ও পেলেন। আরিজোনায় নতুন বাসায় মহা আয়েশে দিন কাটাতে লাগলেন। তিনি এও বলে দিয়েছিলেন যে, মালেক-আশতার প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আসলে ইরানের লং-রেঞ্জ মিসাইলের ওয়ারহেড বানাবার ব্যাপার আড়াল করতে বানানো, যাবতীয় রিসার্চ এখানেই হয়।

তবে মজার ব্যাপার, এক বছর আমেরিকায় কাটাবার পর তার সম্ভবত দেশপ্রেম জেগে ওঠে। তিনি তার দেশ ইরানে ফিরে আসতে চাইলেন। তিনি নাকি নতুন জীবনে অভ্যস্ত হতে পারছিলেন না। বাসায় ধারণ করা এক ভিডিওবার্তায় তিনি বলেন, তাকে আসলে সিআইএ অপহরণ করেছিল। কয়েক ঘণ্টা পরেই তিনি আরেকটি ভিডিও ছাড়লেন, সেখানে বলছেন আগের ভিডিওটা এমনিতেই বানিয়েছেন, ভুয়া। কিন্তু এরপরই তিনি তৃতীয় আরেকটি ভিডিও ছাড়লেন, সেখানে তিনি দ্বিতীয়টিকে ভুয়া বললেন।

পাকিস্তানি দূতাবাসে আলাপ করে তিনি ইরানে ফিরে আসার চেষ্টা করতে লাগলেন। পাকিস্তানি দূতাবাসই যুক্তরাষ্ট্রে ইরানি প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাকিস্তানিরা সাহায্য করল ঠিকই। ২০১০ সালের জুলাই মাসে আমির তেহরানে অবতরণ করলেন। সেখানে তিনি এক প্রেস কনফারেন্স করলেন, বললেন, "সিআইএ তার সাথে গ্রেফতারের পর বাজে আচরণ করেছিল।" এব্যাপারে সিআইএ প্রধান জানান, "আমরা তার কাছ থেকে পেয়ে গিয়েছি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, আর ইরান পেয়েছে স্রেফ লোকটিকে। জিতলো কে?"

ইরান যে ইসরাইলের বিরুদ্ধে কিছুই করছিল না, তা না। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে, ইরান দশজন চরকে গ্রেফতার করে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করার অভিযোগে। ২০০৮ সালে গ্রেফতার করে তিন ইরানিকে, যাদের মোসাদ ট্রেনিং দিয়েছিল। ২০০৮ সালে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় আলী আশতারিকে ইসরাইলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে। মোসাদ তাকে কথা বলার যন্ত্র বিক্রি করতে বলেছিল ইরানি সরকারের লোকদের কাছে, সেটাতে আড়িপাতার যন্ত্র পাতা থাকবে ইসরাইলের জন্য।

এভাবে একের পর এক লোকের কথা বলে শেষ করা যাবে না। তবে এই আলী আসগরি ভদ্রলোককে ইরান রেহাই দেয়নি, ২০২০ সালের জুলাই মাসে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে সিআইএ-র হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করার দায়ে।

২০১০ সালে ইরানের দফারফা হয়ে যায়। ইরানের নিউক্লিয়ার প্রোজেক্টের হাজার হাজার কম্পিউটারে হানা দেয় স্টাক্সনেট ভাইরাস। এই ভাইরাস নাতানজ সেন্ট্রিফিউজের দখল নিয়ে নেয় এবং বিধ্বংসী কাজকর্ম করতে থাকে। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরাইলের আছে এ ভাইরাস ঢুকিয়ে দেয়ার মতো সাইবার অ্যাটাক চালাবার সক্ষমতা। প্রেসিডেন্ট আহমেদানিজাদ প্রথমে খুব চেষ্টা করলেন বোঝাতে যে, এটা কিছুই হয়নি। কিন্তু ২০১১ সালেই বোঝা গেল, ইরানের অর্ধেক সেন্ট্রিফিউজই অকেজো হয়ে গেছে।

দাগানকে বলা হতে লাগলো "বাস্তব জীবনের জেমস বন্ড"। তাকে যখন রামসাদ ('মোসাদপ্রধান' বা 'রশ হা-মোসাদ') হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, তখন বিশেষজ্ঞরা বলছিলেন ২০০৫-এর মধ্যেই ইরান পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন করবে। দাগানের কাজের কারণে এ তারিখ পেছাতে পেছাতে ২০০৭, ২০০৯, ২০১১ ইত্যাদিতে পরিণত হয়। দাগান যখন ২০১১ সালে মোসাদ ছেড়ে গেলেন, তখন বলে গেলেন, ২০১৫ পর্যন্ত ইরান কিছু করতে পারবে না পারমাণবিক প্রকল্প নিয়ে। তাই আর আক্রমণ করে লাভ নেই ইরানে, অন্তত আপাতত।

দাগান সাড়ে আট বছর রামসাদ ছিলেন, তার আমল পর্যন্ত এটাই ছিল সর্বোচ্চ সময় রামসাদ হিসেবে থাকা। তিনি ক্ষমতা দিয়ে গেলেন তামির পার্দোকে। তামিরকে দেয়ার আগে তিনি নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা একাকী বাস করা মোসাদ এজেন্টদের বিপদ-আপদের কথা জানালেন। তার নিজের কিছু ব্যর্থতার কথাও

শোনালেন। কিন্তু তবুও রামসাদ হিসেবে এ পর্যন্ত দাগানকেই বলা হয় সেরাদের সেরা। ইসরাইলি মন্ত্রীরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান তাকে।

তামির পার্দো

২০১০ সালের ১৬ জানুয়ারি মিসরের আল-আহরাম পত্রিকা একটি খবর প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়, "দাগান যদি না থাকতেন মোসাদে, ইরান তাহলে বহু আগেই পারমাণবিক প্রকল্প শেষ করে ফেলত। ইরান জানে এসব নিয়ে তাদের ভূখণ্ডে হওয়া প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ড আর দুর্ঘটনার পেছনে আছে মোসাদ, আর দাগান। ইরান ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশেই সর্বনাশ করেছেন এই লোক। দাগান নামের এই একটি মাত্র লোক ইসরাইলকে সুপার স্টেটে পরিণত করে ছাড়লেন।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধ্যায়-৫

দুবাইয়ে চিরবিদায়

২০১০ সালের জানুয়ারি মাস। উত্তর তেলআবিব।

দুটো কালো অডি এ-সিক্স গাড়ি টিলার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ধূসর দালানের সুরক্ষিত গেট দিয়ে ঢুকে গেল। দালানটিকে ডাকা হয় 'কলেজ'। আসলে এটিই মোসাদের হেডকোয়ার্টার। 'রামসাদ' অর্থাৎ মোসাদের প্রধান মেইর দাগান দ্বিতীয় গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুকে স্বাগত জানালেন। কিছুক্ষণ বাদেই নেতানিয়াহু দাগানের চাকরিসীমা আরও এক বছর বাড়িয়ে দিলেন।

সিরিয়ার রিয়্যাক্টর ধ্বংস আর আরও কিছু মিশনের সফলতার কারণে দাগান আর মোসাদের ফর্ম তখন তুঙ্গে। তবে ইসরাইলের জন্য একটি কাজ করা জরুরি হয়ে পড়েছে তখন— ইসরাইলের দৃষ্টিতে যারা সন্ত্রাসী, তাদের সাথে ইরানের সম্পর্ক বিনষ্ট করা। এজন্য সরিয়ে দিতে হবে একজনকে, নাম তার আল-মাবহুহ। পুরো নাম মাহমুদ আবদেল রাউফ আল-মাবহুহ (محمود عبد الرؤوف المبحوح)। মাবহুহকে হত্যা করার মোসাদ মিশনের কোড নেম ছিল 'প্লাজমা ব্লিস'।

ব্রিফিং রুমে দাগান আর তার সহকর্মীরা উপস্থাপন করলেন, কীভাবে তারা মাবহুহকে হত্যা করবেন। হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থল হবে আরব আমিরাতের দুবাই। নেতানিয়াহু অনুমোদন দিলেন সেদিন এ হত্যাকাণ্ড ঘটানোর। সাথে সাথেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। দুবাইয়ের এক হোটেল রুমে তাকে হত্যা করা হবে, এটাই পরিকল্পনা। লন্ডনের সানডে টাইমস পত্রিকা আমাদের জানায়, মোসাদের হিট টিম তৎকালীন রাজধানী তেলআবিবের এক হোটেলে পুরো মিশন অনুশীলন করে নেয়, কিন্তু এ ব্যাপারে হোটেল কর্তৃপক্ষ কিছুই জানত না।

কে এই মাবহুহ?

আল-মাবহুহ

হামাসের সামরিক শাখার লজিস্টিক্স প্রধান ছিলেন আল-মাবহুহ। ইসরাইল জানায়, মাবহুহ ইরান থেকে সুদান, মিসর আর সিনাই উপত্যকা হয়ে গাজায় অস্ত্র আনতেন। ২০১০ সালে দুজন সাংবাদিক অভিযোগ করে যে, মাবহুহ হামাস আর ইরানের কুদস ফোর্সের মাঝে সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে গোপনে সাহায্য করেছেন। মাবহুহের আরেক নাম 'আবু আবেদ'। তার জন্ম ১৯৬০ সালে গাজা উপত্যকার উত্তরে জাবালিয়া শরণার্থী ক্যাম্পে। সত্তরের দশকের শেষ দিকে তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডে যোগ দেন। ইসরাইলি মতে, মাবহুহ আরব নানা ক্যাফেতে হামলা চালিয়ে জুয়ার আসর বন্ধ করেন। ১৯৮৬ সালে ইসরাইলি আর্মি তাকে গ্রেফতার করে সাথে একে-৪৭ রাইফেল রাখার জন্য। এক বছর পর মুক্তি পেয়ে তিনি হামাসের সামরিক শাখা ইজ আদ্দ্বীন আল-ক্বাসাম ব্রিগেডে যোগ দেন। তার কমান্ডার তাকে হামাসের হয়ে অনেকগুলো মিশনে পাঠান, যার মাঝে ছিল ইসরাইলি সেনা অপহরণ আর হত্যার মিশন। ১৯৮৯ সালে মাবহুহ আর আরেক হামাস সদস্য একটি গাড়ি চুরি করে ধার্মিক ইহুদী ছদ্মবেশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা এক ইসরাইলি সেনাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব দেয়। সেই সেনা, আভি সাসপোর্তাস গাড়িতে উঠতেই মাবহুহ ঘুরে পেছনে তাকালেন তার দিকে, আর সাথে সাথেই মুখের ওপর গুলি চালিয়ে দিলেন। মৃতদেহের সাথে প্রমাণস্বরূপ ছবি তুলে তারা দাফন করে ফেলে সেই সেনাকে। এর তিন মাস পর তারা ইলান সাদন নামের আরেক ইসরাইলি সেনাকে অপহরণ করে আরেক রাস্তা থেকে, এবং তাকেও

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হত্যা করে। পরবর্তীতে আল-জাজিরাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে মাবহুহ নিজেই বিবৃতি দেন যে, তিনি এ হত্যাকাণ্ডগুলো করেছিলেন, এবং লাশগুলো দাফনে সাহায্য করেন।

দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডের পর মাবহুহ মিসরে পালিয়ে যান। সেখান থেকে যান জর্ডানে। তবে সেখান থেকেই তিনি গাজার জন্য কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। কায়রোতে ফিরে আসার পর মিসর তাকে গ্রেফতার করে। ২০০৩ সালের বেশিরভাগ সময় তার কাটে মিসরের জেলে।

মাবহুহ বুঝতে পারেন মোসাদ তাকে সরাতে চাচ্ছে। কেন চাচ্ছে সেটাও বুঝতে পারেন তিনি, একে তো গাজায় অস্ত্র আনছেন, তার ওপর হত্যা করেছেন দুজন ইসরাইলি সেনাকে। তাই তিনি নিরাপদ থাকতে ব্যবসায়ী সেজে ঘুরে বেড়াতে থাকেন মধ্যপ্রাচ্যে, প্রায়ই তিনি পরিচয় বদলাতে লাগলেন। হোটেলের কক্ষে থাকবার সময় চেয়ার দিয়ে দরজা আটকে রাখতেন, যেন হঠাৎ করে ঢুকে কেউ তার ওপর হামলা চালাতে না পারে।

আল-জাজিরাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি হাজির হন এক কালো কাপড়ে মাথা ঢাকা অবস্থায়। সেখানে তিনি বলেন, "ওরা আমাকে তিনবার হত্যা করতে চেষ্টা করেছে, প্রায় মরতে মরতে বেঁচে গেছি প্রত্যেকবার। একবার চেষ্টা করেছে দুবাইতে, একবার ছয় মাস আগে লেবাননে, আরেকবার দুমাস আগে সিরিয়াতে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে লড়ার ফল এটা আমার।"

আল-জাজিরাকে স্বেচ্ছায় তিনি সাক্ষাৎকার দেননি, দিয়েছিলেন হামাসের চাপে। কেউ কেউ বলেন, এই সাক্ষাৎকারের কারণেই মোসাদ তাকে খুঁজে পায়। মাবহুহ এক শর্তে সাক্ষাৎকার দেন, তার চেহারা ব্লার করে দিতে হবে। রেকর্ডিং হবার পর সেই ভিডিও টেপ গাজায় পাঠানো হয়। কিন্তু সেখানে পরীক্ষা করে দেখা গেল, ব্লার করার পরেও তাকে চেনা যাচ্ছে। সেখান থেকেই তাকে আবার বলা হলো সাক্ষাৎকার দিতে। নতুন সাক্ষাৎকার তিনি মারা যাবার আগ পর্যন্ত কিন্তু প্রচারিত হয়নি! মাবহুহ জিজ্ঞেস করেছিলেন, প্রথম সাক্ষাৎকারের সমস্যাটা কী হলো, আর টেপটা কোথায়? তাকে জানানো হয়, টেপটা নিরাপদে আছে হামাসের আর্কাইভে। তবে ধারণা করা হয়, সেই টেপ মোসাদ এজেন্টদের হাতে আসে, যারা তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল হত্যা করার জন্য।

রেকর্ডিংয়ের কয়েক সপ্তাহ বাদে, হামাসের এক সিনিয়র সদস্য এক আরবের কাছ থেকে ফোন কল পেলেন, সেই আরব দাবি করলেন তিনি নাকি অস্ত্রপাচার ব্যবসা করেন। হামাসকে তিনি অস্ত্র সরবরাহ করবেন। হামাসের তো অস্ত্র দরকার। তাই সেই আরব ভদ্রলোককে তারা বললেন দুবাইতে আল-মাবহুহের সাথে দেখা করতে।

কেন দুবাই বেছে নিলেন মাবহুহ? আসলে, এখানেই তিনি তার ইরানি মিত্রদের সাথে দেখা করছিলেন।

সেই রহস্যময় ফোন কলই ছিল মাবহুহের মৃত্যুঘণ্টা।

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মোসাদের একটি মিশন আগা গোড়া ভিডিওতে ধারণা করা হলো। মোসাদের ক্যামেরায় নয়, বিমানবন্দর থেকে শুরু করে অপারেশন প্লাজমা স্ক্রিন কিলিংয়ের মুহূর্তগুলো সমগ্র দুবাই জুড়ে বসানো সিসিটিভি ক্যামেরাগুলোতে ধরা পড়তে থাকে—লবি, করিডোর, লিফট, বাদ যায়নি কিছুই।

এই ভিডিওর বদৌলতে বিশ্ব একটি গুপ্তহত্যা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়। এই সেই ভিডিও, কোডটি স্ক্যান করলে গালফ নিউজের সেই ভিডিও প্রত্যক্ষ করতে পারবেন—

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=bJujIwtdk8w

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সোমবার, ১৮ জানুয়ারি, ২০১০।

দুবাইতে অবতরণ করে বিমান, বেরিয়ে আসে কয়েকজন মোসাদ এজেন্ট। তারা আগে আগে চলে এসেছে। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে আরও অনেক মোসাদ এজেন্ট তাদের সাথে যোগ দেবে। মোট সাতাশজন এজেন্ট কাজ করবে এ মিশনে, এদের মাঝে চারজনের কাছে ব্রিটিশ পাসপোর্ট, চারজনের কাছে ফ্রেঞ্চ পাসপোর্ট, চারজন অস্ট্রেলিয়ান, একজন জার্মান আর ছয়জন আইরিশ।

সবাই এক হোটেলে উঠলো না, একেকজন উঠলো শহরের একেক হোটেলে।

মঙ্গলবার, ১৯ জানুয়ারি, ২০১০।

রাত ১২:০৯

দুজন মোসাদ এজেন্ট এসে নামলেন দুবাইতে, দুজনেরই মাথায় টাকের আভাস। একজন জার্মান পাসপোর্টধারী মাইকেল বডেনহাইমার, বয়স ৪৩ বছর। অন্যজন তার বন্ধু, ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী জেমস লেনার্ড। দুজনেই মারাত্মক হত্যা মিশনের অ্যাডভান্সড টিমের অংশ হিসেবে এসেছেন।

রাত ১২:৩০

প্যারিস থেকে এসে নামলেন কেভিন ড্যাভেরন। তিনি এ অপারেশনের কমান্ডার। চোখে চশমা, মুখে ছাগুলে-দাঁড়ি। সাথে লালচুলো নারী গাইল ফলিয়ার্ড, তিনি তার ডেপুটি। দুজনেরই আইরিশ পাসপোর্ট।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাত ১:২১

গাইল ফলিয়ার্ড জুমাইরা হোটেলে চেক-ইন করলেন। লিফটের এগারো তলায় একটি রুমে উঠে পড়লেন। রিসেপশনে তাকে বাসার ঠিকানা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। চোখের পলক না ফেলে তিনি উত্তর দিলেন, ৭৮ মেমিয়ার রোড, ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড। তখনও তারা জানতো না, এই ঠিকানায় কিছু নেই আয়ারল্যান্ডে।

রাত ১:৩১

কমান্ডার কেভিন ড্যাভেরন তার ডেপুটির সাথে যোগ দিলেন জুমাইরা হোটেলে। তার রুম নাম্বার ৩৩০৮।

রাত ২:২৯

মিশনের লজিস্টিক্স কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করা পিটার এলভিঞ্জার ফরাসি পাসপোর্ট নিয়ে অবতরণ করলেন দুবাইতে। দেখতে হালকা পাতলা গড়নের, চোখে বাহারি চশমা। তার হাতে সন্দেহজনক একটি কেস।

রাত ২:৩৬

বিমানবন্দরেই মিশনের আরেক এজেন্টের সাথে পিটারের দেখা হয়। তারা দুজন একসাথে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে গেলেন কোনো এক হোটেলের উদ্দেশ্যে।

সকাল ১০:১৫

মিশনের টার্গেট মাহমুদ আল-মাবহুহ সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক থেকে এমিরাতস এয়ারলাইন্সের সরাসরি ফ্লাইটে উঠলেন, গন্তব্য দুবাই। ইরানি দলের সাথে গাজায় অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে মিটিং আছে তার দুবাইতে।

সকাল ১০:৩০

হোটেল ত্যাগ করে মিশন সমন্বয়কারী পিটার একটি বড় শপিং মলে দেখা করলেন তার দলের অন্যদের সাথে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সকাল ১০:৫০

কমান্ডার কেভিন আর তার ডেপুটি লালচুলো গাইল মিটিংয়ে যোগ দিলেন সেই শপিং মলে। কেভিন এখন আর চশমা পরে নেই, তার ছোট গোঁফও আর দেখা যাচ্ছে না।

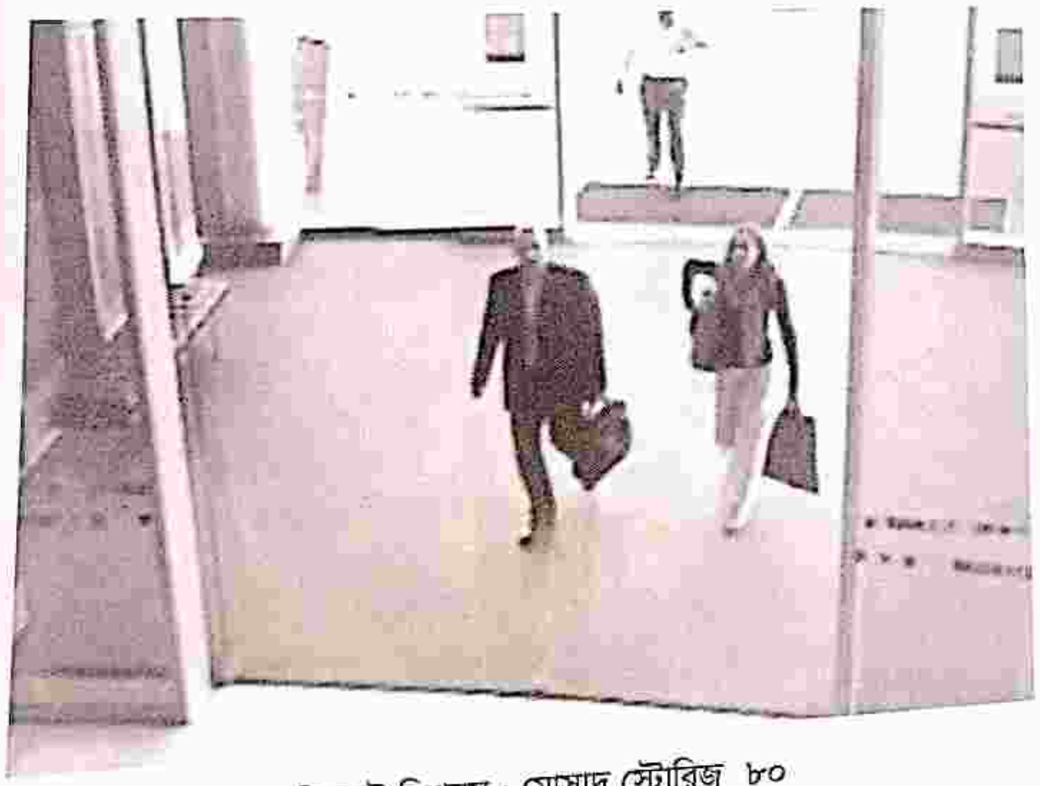

দুপুর ১২:১৮

বৈঠক শেষে সবাই যার যার মতো চলে গেল। কেভিন ফিরে এলেন জুমাইরা হোটেলে, এরপর চেক আউট করলেন। ক্যামেরায় আমরা দেখতে পাই, তিনি আরেক হোটেলে ঢুকছেন, সেখানে তিনি পরচুলা পরলেন, সাথে চশমা আর নকল গোঁফ।

দুপুর ২:১২

টেনিস খেলার পোশাক পরে থাকা দুজন এজেন্ট দুবাইয়ের বিলাসবহুল আল-বুস্তান রোটানা হোটেলে প্রবেশ করলেন। তাদের কাজ কখন আল-মাবহুহ এসে হাজির হন, সেটা খেয়াল রাখা। শীঘ্রই তার আসার কথা।

দুপুর ৩:১২

ডেপুটি গাইলও জুমাইরা হোটেল ত্যাগ করলেন। এক রাতের জন্য তিনি ভাড়া দিলেন ৪০০ মার্কিন ডলার।

দুপুর ৩:১৫

মাহমুদ আল-মাবহুহ দুবাইতে অবতরণ করলেন। ইমিগ্রেশন বুথে নকল ইরাকি পাসপোর্ট দেখালেন, বললেন তিনি টেক্সটাইল ব্যবসায় আছেন।

দুপুর ৩:২৫

ডেপুটি গাইল আরেক হোটেলে উঠলেন। কাপড় বদলাবার পর তিনি পরচুলাও পরে নিলেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুপুর ৩:২৮

মাবহুহ এসে পৌঁছালেন আল-বুস্তান রোটানা হোটেলে। চেক ইনের সময় তিনি এমন একটি রুম চাইলেন, যেখানে কোনো টেরেস থাকবে না, আর জানালাগুলো সিলগালা থাকবে। তাকে লিফটের দুই তলায় ২৩০ নাম্বার রুম দেয়া হলো। তিনি জানতেন না তার সাথে লিফটে ওঠা টেনিস প্লেয়ার দুজন মোসাদ এজেন্ট।

দুপুর ৩:৩০

বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে টেনিস প্লেয়ার এজেন্টরা জানলেন মাবহুহ এসেছেন তার রুমে, তার উল্টো পাশের রুমের নাম্বার হলো ২৩৭।

বিকেল ৩:৫৩

কো-অর্ডিনেটর পিটার মাবহুহের সেই হোটেলে এসে ঢুকলেন। ২৩৭ নাম্বার রুম রিজার্ভ করলেন তিনি।

বিকেল ৪:০৩

নতুন পর্যবেক্ষক দল আগের টেনিস প্লেয়ারদের জায়গা নিলো। এবার তাদের কাজ, কখন মাবহুহ রুম থেকে বের হন, সেটা জানানো।

বিকেল ৪:১৪

মোসাদের হিট টিমের ২৭ জনই এখন আল-বুস্তান রোটানা হোটেলে।

বিকেল ৪:২৩

মাবহুহ রুম থেকে বের হলেন। তিনি লবি চেক করে নিশ্চিত হয়ে নিলেন, কেউ তাকে দেখছে না। এরপর হোটেল থেকে বের হলেন। পর্যবেক্ষকেরা তাকে অনুসরণ করতে লাগলো।

বিকেল ৪:২৪

পর্যবেক্ষকরা টিম কমান্ডারকে জানালো, কোন গাড়ি মাবহুহকে ডাউনটাউন নিয়ে চলেছে।

বিকেল ৪:২৭

কো-অর্ডিনেটর পিটার লবিতে প্রবেশ করে কেভিনকে তার কেসটা দিলেন, ভেতরে সম্ভবত মাবহুহকে হত্যার সরঞ্জামাদি রয়েছে।

বিকেল ৪:৩৩

পিটার রিসেপশন ডেস্কে গেলেন, চেক ইন করলেন, ২৩৭ নম্বর রুমের চাবি পেলেন। ঠিক মাবহুহের রুমের উল্টো পাশেরটা।

বিকেল ৪:৪০

পিটার কেভিনকে রুমের চাবি দিলেন, এরপর হোটেল থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিকেল ৪:৪৪

কেভিন ২৩৭ নাম্বার রুমে ঢুকলেন। তিনি জানালা চেক করলেন, এরপর দরজার ফুটো চেক করে নিশ্চিত হলেন, আল-মাবহুহ রুমে ফেরত এলে এর ভেতর দিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

বিকেল ৫:০৬

ডেপুটি গাইল ২৩৭ নম্বর রুমে এলেন। গাইল আর কেভিন সময়সূচী যাচাই করে নিলেন। তারা নিয়মিত আপডেট পাচ্ছেন মাবহুহ শহরের কোথায় কোথায় যাচ্ছেন।

বিকেল ৫:৩৬

একজন পর্যবেক্ষক এজেন্ট ক্যাপ পরে হোটেলে প্রবেশ করলেন। শূন্য কোরিডরের শেষ মাথায় গিয়ে তিনি ক্যাপ বদলে পরচুলা পরে নিলেন।

সন্ধ্যা ৬:২১

গাইল ২৩৭ নম্বর রুম থেকে বের হলেন। তার হাতে সেই কেস, পিটার কেভিনকে দিয়েছিলেন এটা। তিনি পার্কিং লটে গিয়ে টিমের আরেকজনকে কেসটা দিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যা ৬:৩২

হত্যা করবে যে ক'জন তাদের প্রথমজন পার্কিং লট ছেড়ে হোটেল লবিতে প্রবেশ করল।

সন্ধ্যা ৬:৩৪

দ্বিতীয়জনও একইভাবে হোটেলে প্রবেশ করল, এরপর বিলাসবহুল লবির কোণায় একটি সোফায় বসে পড়ল। প্রথমজন থেকে যতটা দূরে সম্ভব হয়।

সন্ধ্যা ৬:৪৩

টেনিস পোশাক পরা সেই এজেন্টরা হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যা ৭:৩০

কো-অর্ডিনেটর পিটার জার্মানির মিউনিখের উদ্দেশ্যে এক ফ্লাইটে করে দুবাই ত্যাগ করলেন।

রাত ৮:০০

সেকেন্ড ফ্লোর পরিষ্কার করতে আসা কর্মী চলে গেলেন। সাথে সাথেই হিট টিমের লোকেরা চেষ্টা করল মাবহুহের রুমে ঢোকার।

রাত ৮:০৪

লিফটের কাছে দাঁড়ানো কেভিন ইশারা দিলেন তাদেরকে রুমে ফিরে যেতে, কারণ এ ফ্লোরে লিফট থামছে, হোটেলের একজন অতিথি আসছেন। কিন্তু হোটেলের ইলেক্ট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেম জেনে গেল, মাবহুহের রুম ২৩০-এ কেউ একজন চেষ্টা করেছে ঢোকার।

রাত ৮:২০

মাবহুহ ফিরে এলেন হোটেলে। পর্যবেক্ষকেরা কেভিনকে জানালো, মাবহুহ লিফটের দিকে এগুচ্ছেন।

রাত ৮:২৭

মাবহুহ নিজের রুমে ঢুকলেন। কেভিন আর গাইল ঐ ফ্লোরের করিডোরে পাহারা দিতে লাগলেন লিফটের পাশে দাঁড়িয়ে। ওদিকে, ২৩০ নম্বর রুমে হত্যাকাণ্ড চলছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাত ৮:৪৬

হিট টিমের চারজন হোটেল ত্যাগ করল।

রাত ৮:৪৭

হিট টিমের আরেকজন আর সাথে গাইল হোটেল ত্যাগ করলেন।

রাত ৮:৫১

কেভিন মাবহুহের রুমে প্রবেশ করলেন হত্যাকাণ্ডের পর, এরপর দরজার হ্যান্ডেলে "ডু নট ডিস্টার্ব" লেখা ঝুলিয়ে দিলেন।

রাত ৮:৫২

হোটেল থেকে পর্যবেক্ষক এজেন্টরা বেরিয়ে গেল।

রাত ১০:৩০

কেভিন আর গাইল প্যারিস যাবার সরাসরি ফ্লাইটে উঠে পড়লেন। ত্যাগ করলেন দুবাই। কাছাকাছি সময়েই বাকি সদস্যরাও বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

রাত দশটার দিকে মাবহুহের স্ত্রী তার মোবাইল ফোনে কল দিলেন। কিন্তু পেলেন না। সরাসরি ভয়েস মেইলে চলে গেল। বারবার তিনি কল দিয়ে চললেন, কোনো সাড়া শব্দ নেই। মাবহুহের ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুও চেষ্টা করলেন তার সাথে যোগাযোগ করার, কিন্তু পারলেন না।

মাবহুহকে পাঠানো টেক্সট মেসেজগুলোর কোনো উত্তর এলো না। সময় বয়ে যেতে লাগলো, কিন্তু মাবহুহের কোনো খোঁজ নেই। চিন্তিত স্ত্রী হামাস নেতাদের ফোন দিলেন। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, দুবাইতে থাকা হামাস সদস্যকে আল-বুস্তান রোটানা হোটেলে পাঠাবেন।

ফাইভ স্টার আল বুস্তান রোটানা হোটেল

সেই লোক রিসেপশনে গিয়ে কল দিতে বললেন ২৩০ নম্বর রুমে। কেউ উত্তর দিল না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মধ্যরাতের পর হোটেলের কর্মীরা অবশেষে মাবহুহের রুমে গেল, দরজা আনলক করল, এবং আবিষ্কার করল তার নিথর দেহ। একজন ডাক্তার ছুটে গেলেন রুমে। দেহ পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, তিনি আগেই মারা গিয়েছেন। ডাক্তার জানালেন, তার মৃত্যুর কারণ হার্ট অ্যাটাক।

আল বুস্তান রোটানা হোটেলের একটি কক্ষ

হামাস অফিশিয়ালি জানালো, মাবহুহের মৃত্যু হয়েছে স্বাস্থ্যগত কারণে। কিন্তু মাবহুহের পরিবার সেটি মানলো না। তারা বলে চলল, মোসাদই খুন করেছে মাবহুহকে। তার লাশ দুবাইয়ের একজন মেডিকেল পরীক্ষকের কাছে পৌঁছালো, রক্তের নমুনা পাঠানো হলো ফ্রান্সের এক ল্যাবে।

নয়দিন বাদে রিপোর্ট এলো। হামাস ঘোষণা করলো, মোসাদ এজেন্টরা হত্যা করেছে মাবহুহকে। তাকে প্রথমে ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে নিস্তেজ করা হয়, এরপর বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে মোসাদ এজেন্টরা। একই সময়ে, দুবাই পুলিশ জানালো, মাবহুহের রক্তে কোনো বিষ পাওয়া যায়নি। কিন্তু এটা তারা বুঝতে পারলো, তাদের নাকের ডগার নিচে দিয়ে মোসাদ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে গিয়েছে।

৩১ জানুয়ারি, অর্থাৎ মাবহুহের মৃত্যুর ১২ দিন পর, লন্ডনের সানডে টাইমস পত্রিকা খবর ছাপায়, মোসাদ বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছে মাবহুহকে।

সাংবাদিকের দাবি, মোসাদের হিটম্যানরা মাবহুহের রুমে ঢুকে ইনজেকশন দেয়, ফলে তার হার্ট অ্যাটাকের মতো কিছু হয়। এরপর এজেন্টরা সব নথিপত্রের ছবি তুলে বেরিয়ে যায় হ্যান্ডেলে 'ডু নট ডিস্টার্ব' সাইন ঝুলিয়ে দিয়ে।

লন্ডনের টেলিগ্রাফ পত্রিকা জানালো, মোসাদের গুপ্তহত্যার স্টাইলের সাথে এটা মিলে গিয়েছে। হিট টিমের এগারো জনের মাঝে ছয়জনই ছিল নারী। এদেরকে বাছাই করা হয় কিদন অপারেশনাল ইউনিটের ৪৮ জন সদস্যের মধ্য থেকে। ইসরাইলের হারেৎস পত্রিকা বলল, ক্যামেরায় যেমনটা দেখা গিয়েছে, এগুলো নিশ্চিত মোসাদেরই কাজ; এই যে একেক সময় একেক দেশ থেকে এসে আবার ফেরত যাওয়া, এগুলো মোসাদের কাজের সাথে মিলে যায়। জার্মান পত্রিকাও মোসাদের বিষয়টা নিশ্চিত করে। একে একে বিভিন্ন দেশের নকল পাসপোর্ট ব্যবহারের বিষয়টিও বেরিয়ে আসে। দুবাই পুলিশের প্রধান খালফান তামিম বলেন, "আমরা ডিএনএ স্যাম্পল আর আঙুলের ছাপ নিলাম প্রথমে। এরপর দেখা গেল সবাই সত্যিকারের পাসপোর্ট ব্যবহার করছে, কিন্তু তথ্য সব ভুয়া। তারপর জানতে পারলাম, এরা আসলে সবাই ইসরাইলি। বোঝাই যাচ্ছে, খুনটা মোসাদ করেছে, একশ পারসেন্ট নিশ্চিত।"

পুলিশপ্রধান তামিমের কল্যাণে এই সিকিউরিটি টেপগুলো সবাই দেখতে পেল। কীভাবে প্রতিটি ধাপ কার্যকর করা হলো, তা সিনেমার মতো স্পষ্ট।

প্রশ্ন হলো, মোসাদ কি জানতো না যে দুবাইতে এত সিসিটিভি ক্যামেরা আছে? তামিম জানিয়েছেন, এর আগেও ইসরাইলি এজেন্টরা দুবাই ঘুরে গিয়েছে এই মিশনের প্রস্তুতি নিতে। তারা কি ক্যামেরাগুলো দেখেনি? তাই যদি হয়, তাহলে এই যে মহরত, ছদ্মবেশ পরিধান, হোটেলে আসা, বেরিয়ে যাওয়াড় সব কিছু আসলে শো। অনেককেই মিশনে শুধু একটি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছেড় টেপগুলো যিনি পরীক্ষা করবেন, তিনি যেন বিভ্রান্ত হন, তাই।

মোসাদ কি জানতো না যে তাদের চেহারা ধরা পড়বে, তাদের ছবি তোলা হবে ইমিগ্রেশনে?

সিকিউরিটি ক্যামেরাগুলো সবগুলো মুহূর্ত ধারণ করতে পারলো, কিন্তু কেন দুটো জিনিস ধারণ করেনি? মাবহুহের রুমে ঢোকা আর বের হওয়ার মুহূর্ত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পুলিশপ্রধান তামিম জানান, অস্ট্রিয়ার একটি নাম্বার ব্যবহার করে তারা যোগাযোগ করেছে নিজেদের মধ্যে। আরও জানা গেল, তারা প্যায়োনিয়ার-মাস্টারকার্ড ব্যবহার করে নানা পেমেন্ট করেছে দুবাইতে।

দুবাইয়ের পুলিশ প্রধান

মজার ব্যাপার, তারা কিন্তু সত্যিকারের পাসপোর্ট ব্যবহার করেছে, দ্বৈত নাগরিকত্বের। তাদের প্রবাসী তথ্য ভুল হলেও ইসরাইলের তথ্য সঠিক। হিট টিমের সদস্যরা ধরা পড়লেও তারা কনসুলে আশ্রয় নিতেই পারে, তাদেরকে সরকার সাহায্য করতে বাধ্য।

ঘটনা জানাজানির পর ইসরাইলের জন্য ঝামেলাই হলো। যে দেশগুলোর পাসপোর্ট ব্যবহার করা হয়েছিল, সে দেশগুলোর মাঝে গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া আর আয়ারল্যান্ড তাদের দেশ থেকে মোসাদ প্রতিনিধিদের বের করে দিল। পোল্যান্ড উরি ব্রডস্কি নামের একজনকে ওয়ারস' বিমানবন্দরে গ্রেফতার করে, এরপর জার্মানিতে পাঠিয়ে দেয় শাস্তির জন্য। ব্রডস্কি মোসাদ এজেন্ট মাইকেল

বর্ডেনহাইমারকে সাহায্য করেছিলেন। ব্রডস্কি অবশ্য ৬০,০০০ ইউরো জরিমানা দিয়ে ছাড়া পেয়ে যান। তবে বর্ডেনহাইমারের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

দুবাই পুলিশ টিম একজন মোসাদ সদস্যকেও গ্রেফতার করতে পারেনি। তবে এখানে কিছু করতে গেলে নিঃসন্দেহে তা ধরা পড়বে সিসিটিভি ক্যামেরায়, এটা ভেবেই তুষ্ট থাকলো দুবাই পুলিশ।

পরের বছর ইসরাইলি শক্তিশালী শোভাল ড্রোন আক্রমণ করে সুদানের বন্দরের পনের কিলোমিটার দূরে এক গাড়ির ওপর। দুজন লোক মারা যায় তাতে। এর মধ্যে একজন হামাস নেতা। হামাস সুদানের মধ্য দিয়ে ইরান থেকে গাজাতে অস্ত্র আনে। সুদান সরকার সাথে সাথেই ইসরাইলকে দায়ী করে এ ঘটনার জন্য।

এ আক্রমণ থেকে আন্দাজ করাই যায়, হোটেল রুম থেকে ছবি তুলে নেয়া সেই গোপন নথিপত্রগুলো কাজে লাগিয়েছিল ইসরাইল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধ্যায়-৬

দামেস্কের গুপ্তচর

প্রিয় নাদিয়া, প্রিয় পরিবার,

আমি এ চিঠি লিখছি আমার শেষ কথা হিসেবে, আশা করি তোমরা আজীবন একসাথে থাকতে পারবে। আমার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, অনুরোধ করছি সে যেন নিজের যত্ন নেয়, বাচ্চাদের ভালো লেখাপড়া শেখায়... প্রিয় নাদিয়া, তুমি আরেকটা বিয়ে করবে, যেন আমাদের বাচ্চারা একটা বাবা পায়। তোমাকে কেউ বাধা দেবে না। আগের কথা মনে রেখো না, সামনের দিকে তাকাবে। আমার শেষ চুম্বন পাঠাচ্ছি তোমাকে।

আমার আত্মার জন্য প্রার্থনা করো।

তোমারই,

এলি

১৯৬৫ সালের মে মাসে এই চিঠিটা নতুন রামসাদের টেবিলে এসে পৌছায়। আকস্মিক মৃত্যুর মাত্র কয়েক মিনিট আগে ইসরাইলের গুপ্তচর ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত স্পাই হিসেবে পরিচিত মোসাদ এজেন্ট এলি কোহেন কাঁপা হাতে লিখেছিলেন চিঠিটি।

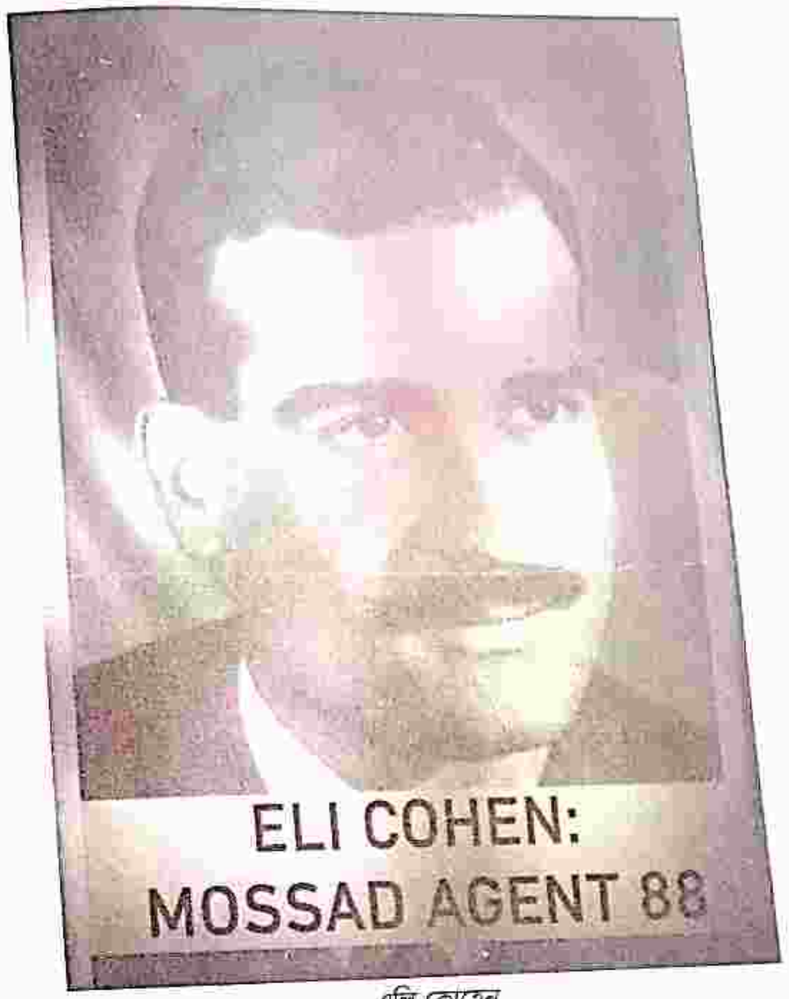

এলি কোহেন

এর অনেক বছর আগেই মিসরীয় ইহুদী এলি কোহেন তার গোপন জীবন শুরু করেন; নিজের নামে নয়, অন্য নামে।

ঘটনার শুরু ১৯৫৪ সালের মধ্য-জুলাইয়ের এক ভ্যাপসা বিকেলে। তরুণ এলি কোহেন বাড়ি ফিরছেন। বয়স তার ত্রিশ, কালো গোঁফ, চমৎকার মুচকি হাসি। কায়রোর রাস্তায় এক পুরনো বন্ধুর সাথে তার ধাক্কা লাগলো, পেশায় সেই বন্ধু পুলিশ অফিসার।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আজকে রাত্রে আমরা কিছু ইসরাইলি সন্ত্রাসী গ্রেফতার করব," বললেন সেই অফিসার। "এদের একজনের নাম শমুয়েল আজার।"

এলি বিস্মিত হবার ভাব দেখালেন, বাহবা দিলেন। কিন্তু যেই না তার বন্ধু চলে গেলেন, সাথে সাথে তিনি তার ভাড়া বাসায় দৌড়ে গেলেন। লুকোনো জায়গা থেকে তার বন্দুক, বিস্ফোরক আর দরকারি কাগজপত্র সরিয়ে রাখলেন। চোরাগোপ্তা কাজে ভয়ংকরভাবে জড়িত এলি কোহেন; তার কাজ, নকল কাগজপত্র বানিয়ে দিয়ে এখানকার ইহুদী পরিবারগুলোকে পালানোর সুযোগ করে দেয়া, ইসরাইলে আলিয়া করিয়ে দেয়া। আন্ডারগ্রাউন্ডের ইহুদীদের তৈরি এক দলের সদস্যও তিনি। দলটি আবার 'ল্যাভন অ্যাফেয়ার' নামের এক উচ্চাভিলাষী অপারেশনের হোতা।

১৯৫৪ সালে ইসরাইলি নেতারা জানতে পারেন, ব্রিটিশরা মিসর ছেড়ে চলে যাবে। মিসর তখন ইসরাইলের চরমতম শত্রু, আর আরব দেশগুলোর মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী। যতদিন ব্রিটিশরা মিসরে আছে, ততদিন মিসরের সামরিক বাহিনীকে লাগাম দিয়ে রাখবে তারা— এতটুকু আস্থা ইসরাইলের ছিল। কিন্তু এই খবর শুনে তাদের মাথায় হাত, এখন কী হবে? এত সব সামরিক অস্ত্র, বিমানবন্দর, যন্ত্রপাতি মিসরের বাহিনীর হাতে চলে গেলে ইসরাইলের খবরই আছে। ইসরাইলের বয়স তখন মাত্র ৬ বছর। মিসর অবশ্যই তাদের সাথে যুদ্ধে হারার প্রতিশোধ নিতে চাইবে।

প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ন চলে যাবার পর এখন যিনি ক্ষমতায় এসেছেন, সেই মোশে শারেৎ অপেক্ষাকৃত দুর্বল নেতা। তিনি কি আর পারবেন ব্রিটিশদের বলে কয়ে রাজি করাতে মিসরে রয়ে যেতে? মনে হয় না পারবেন।

প্রধানমন্ত্রীকে না জানিয়ে তাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আমানের প্রধান মিলে একটা পরিকল্পনা করলেন। তারা ব্রিটেন-মিসরের পুরনো চুক্তিপত্র ঘেঁটে বের করলেন যে, যদি দেখা যায় মিসরে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আর বোমাহামলা বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে ব্রিটেন এই সিদ্ধান্তে আসবে যে, মিসরের নেতারা আইন রক্ষা করতে পারছেন না। সেক্ষেত্রে ব্রিটিশরা চলে যাবে না। অন্তত তাদের ধারণা সেটাই ছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নাম পিনহাস ল্যাভন, আর আমানের প্রধান কর্নেল বিনইয়ামিন গিবলি।

ল্যাভন আর গিবলি মিলে কায়রো আর আলেক্সান্দ্রিয়ায় বোমা হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, তাদের টার্গেট আমেরিকান আর ব্রিটিশ লাইব্রেরি, সংস্কৃতি কেন্দ্র, সিনেমা হল, পোস্ট অফিস, সরকারি দালান ইত্যাদি। আমানের সিক্রেট এজেন্টরা মিসরের স্থানীয় জায়োনিস্ট ইহুদীদের দলে টানলো, তারা ইসরাইলের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত।

পঞ্চাশের দশকে আলেক্সান্দ্রিয়া

এ কাজ করতে গিয়ে আমান ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার একটা নীতি ভঙ্গ করলো। নীতিটি ছিল, কখনও স্থানীয় ইহুদীদের কাজে লাগাবে না, তাহলে পুরো ইহুদী কমিউনিটিই বিপদে পড়তে পারে। তার ওপর, যারা এ কাজে এগিয়ে আসতে চাইলো, তাদের কারোরই কোনো সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল না।

গোড়া থেকেই এ পরিকল্পনা মাঠে মারা পড়তে লাগলো। একদমই নিচু মানের হাতে বানানো বোমা ব্যবহার করা হতো। ছোটখাট কয়েকটা বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার পর, ২৩ জুলাই অঘটন ঘটলো। আলেক্সান্দ্রিয়ার রিও সিনেমা হলের গেটে জায়োনিস্ট নেটওয়ার্কের এক সদস্যের পকেটেই বোমা বিস্ফোরণ হলো। দুর্বল বোমায় তার প্রাণ নাশের মতো কিছু হয়নি। কিন্তু পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পরের কয়েকদিনে জায়োনিস্ট নেটওয়ার্কের সকলেই ধরা পড়লো।

এলি কোহেনকেও গ্রেফতার করা হলো, কিন্তু তার ফ্ল্যাট তল্লাশি করে তাকে আটকে রাখার মতো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাকে ছেড়ে দেয়া হলো, কিন্তু পুলিশ তার নামে একটি ফাইল খুলে রাখলো। তার তিনটি ছবির সাথে, সেখানে তার সম্পর্কে তথ্য লেখা— এলি শাওল জুন্দি কোহেন, জন্ম ১৯২৪ সালে আলেক্সান্দিয়ায়, পিতা-মাতা শাউল এবং সোফি কোহেন। এলির দুই বোন আর পাঁচ ভাই পিতা-মাতাসহ কোথাও চলে গিয়েছে মিসর ছেড়ে। সন্দেহভাজন এলি কোহেন ফ্রেঞ্চ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট করা, এখন কায়রোর ফারুক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বালক এলি কোহেন

মিসরীয় পুলিশ জানতো না, এলির পরিবার ইসরাইলে পালিয়ে গিয়েছে, এখন তেলআবিবের এক মফস্বলে বাস করছে, জায়গাটার নাম বাৎ ইয়াম।

এই গ্রেফতারের ঘটনার পরও এলি সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি মিসরে থেকে যাবেন, পালাবেন না। তিনি তার সহকর্মী আর বন্ধুদের জেলহাজতের খবরাখবর নিতে থাকলেন।

অক্টোবর মাসে এসে তাদের কথা জানালো মিসরীয় সরকার, ঘোষণা করলো যে তারা ইসরাইলি গুপ্তচরদের গ্রেফতার করেছে। ডিসেম্বরের ৭ তারিখ কায়রোতে ট্রায়াল শুরু হলো। গ্রেফতারকৃতদের মাঝে একজনের নাম ম্যাক্স বেনেট, আদতে তিনি ইসরাইলি আন্ডারকভার এজেন্ট। জেলের শিকের দরজা থেকে বের করে আনা জং-ধরা এক পেরেক দিয়ে তিনি কবজি কেটে আত্মহত্যা করলেন। ট্রায়ালে বাদী পক্ষ কয়েকজনের ফাঁসি দাবি করলেন। ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন থেকে অনুরোধ আসতে লাগলো তাদের ক্ষমা করে দেবার জন্য। কে শোনে কার কথা? পরের বছর জানুয়ারির ১৭ তারিখ রায় দেয়া হলো— দুজনকে নির্দোষ হিসেবে মুক্তি, দুজনকে

সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, দুজনকে পনেরো বছর আর দুজনকে যাবজ্জীবন। দুজন নেতাকে চারদিন বাদে কায়রো জেলখানাতেই ফাঁসিতে ঝোলানো হলো।

ইসরাইলে তখন তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে গেল। কে এই অপারেশনের আদেশ দিয়েছিল? কয়েক দফা তদন্ত কমিটি গঠন করেও সুনির্দিষ্ট ফলাফল পাওয়া গেল না। ড্যাভন আর গিবলি একে অন্যের দিকে আঙুল তাক করতে থাকলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ড্যাভন পদত্যাগ করলেন, তার জায়গায় এলেন অবসর থেকে ফিরে আসা বেনগুরিয়ন। কর্নেল গিবলির আর কোনোদিন পদোন্নতি হলো না, কয়েকদিন পর তাকে আর্মি ছাড়তে হয়।

মিসরে এলি কোহেন তার ঘনিষ্ঠ কজন বন্ধুকে হারালেন। এদিকে তার নিজের নামে ফাইল খোলা আছে, তিনি একজন সন্দেহভাজন সরকারের চোখে।

এলি অবশেষে ইসরাইলে চলে যান সুয়েজ যুদ্ধের পর, ১৯৫৭ সালে।

সাবেক রাজধানী তেলআবিবের মফস্বল এলাকা বাৎ ইয়ামের এক রাস্তার নাম 'কায়রো শহীদ'। এই যে একটু আগে বলা সেই কায়রোর ঘটনার স্মরণেই এমন নামকরণ।

এলি কোহেন তার পরিবারের সাথে দেখা করতে প্রতিদিনই এ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আমানের জন্য অনুবাদকের কাজ করছেন তিনি। তার সৌভাগ্য, তিনি একই সাথে আরবি, ফরাসি, ইংরেজি আর হিব্রুতে পারদর্শী। তার কাজ হলো আমানের জন্য সাপ্তাহিক আর মাসিক ম্যাগাজিনগুলো ভাষান্তর করা। তেলআবিবের যে রাস্তায় তার অফিস, কেউ সেখান থেকে ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না, এটা গোয়েন্দা সংস্থার অফিস। কারণ, অফিসটি আছে কমার্শিয়াল এজেন্সির ছদ্মবেশে। এলির বেতন খারাপ না, মাসে ১৭০ ইসরাইলি পাউন্ড, মানে ৯৫ ডলার। কয়েক মাস পরেই অবশ্য তিনি চাকরি খোয়ালেন।

তার এক মিসরীয় ইহুদী বন্ধু এক চেইনশপে অ্যাকাউন্ট্যান্টের চাকরি খুঁজে দিল তাকে। খুবই একঘেয়ে চাকরি, কিন্তু বেতনটা বেশি।

এরকম সময়ে তার ভাইয়ের খাতিরে, এক চমৎকার নার্স মেয়ের সাথে এলির পরিচয় হলো। মেয়েটি এসেছে ইরাক থেকে।

এক মাস দেখাদেখির পর এলি নাদিয়াকে বিয়েই করে ফেললেন। নাদিয়া আবার উদীয়মান বুদ্ধিজীবী সামি মিকায়েলের বোন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এলি কোহেনের বিয়ের ছবি

এক সকালে এলির অফিসে প্রবেশ করলেন এক ভদ্রলোক। বললেন, "আমার নাম জালমান, আমি একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসার। আমি তোমাকে একটা চাকরির প্রস্তাব দিতে চাই।"

"কীরকম চাকরি?"

"একঘেয়ে চাকরি না। তোমাকে প্রচুর ইউরোপ ঘুরতে হবে। আরব দেশগুলোতেও যাওয়া লাগতে পারে আমাদের এজেন্ট হিসেবে।"

এলি না করলেন, বললেন, "আমি মাত্র বিয়ে করেছি। এখন আর ইউরোপ বা অন্য কোথাও ঘুরতে চাই না।"

কথা ওখানেই শেষ, কিন্তু ঘটনা শেষ নয়। নাদিয়া গর্ভবতী হয়ে পড়লেন, চাকরি ছাড়তে বাধ্য হলেন। সেই চেইন স্টোরেরও কিছু কর্মী ছাটাই করতে হলো, এলি তাদের একজন। তিনি আর কোনো চাকরি খুঁজে পেলেন না। ঠিক এরকম সময়ে তার ভাড়া বাসায় কেউ নক করল।

দরজা খুলে এলি দেখলেন, জালমান দাঁড়িয়ে!

"তুমি কেন আমাদের জন্য কাজ করতে চাইছো না?" এলিকে জিজ্ঞেস করলেন জালমান। "আমরা তোমাকে মাসে ৩৫০ পাউন্ড দেব (১৯৫ ডলার)। ছয় মাস ট্রেনিং করবে। এরপর চাইলে থাকতে পারো, কিংবা চলে যেতে পার।"

এবার এলি আর না বললেন না। তিনি যোগ দিলেন সিক্রেট এজেন্ট হিসেবে।

আমানের কয়েকজন প্রাক্তন কর্মী অবশ্য ঘটনাটা ভিন্নভাবে বলেন। তাদের মতে, ইসরাইলে আসার পর এলি প্রথমে চাকরি পাননি আমানে। কারণ, তার স্কোর কম এসেছিল আমানের পরীক্ষায়, তাকে নাকি অতি-আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছে, যতটা দরকার তার চাইতেও বেশি। প্রতিভাবান, সাহসী, স্মৃতিশক্তি ভালো, সবই ঠিকড়কিন্তু নিজেকে খুব বেশি ভালো মনে করেন এলি, অযথা ঝুঁকি নিতে চান। এগুলো আমানের সাথে যায় না।

কিন্তু ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ঘটনাপ্রবাহ বদলে গেল। আমানের ইউনিট ১৩১ খুব জরুরি ভিত্তিতে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে একজন সিক্রেট এজেন্ট খুঁজতে লাগলো। সিরিয়া তখন ইসরাইলের জাতশত্রু, আক্রমণের সুযোগ পেলেই আক্রমণ করবে। গোলান হাইটস আর গালিলি সাগরের পাড়ে অনেকবার সিরিয়ার সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ হয়েছে। এবার সিরিয়া চাচ্ছে জর্ডান নদীর গতিপথে বদল আনতে, এতে করে ইসরাইল পানি পাবে না।

জর্ডানের পানি ছাড়া ইসরাইল টিকতে পারবে না। সিরিয়াকে তাই ইসরাইল সফল হতে দেবে না। কী করা যায়? দামেস্কে একজন এজেন্ট লাগবে, সাহসী আত্মবিশ্বাসী আর বিশ্বস্ত কোনো স্পাই। যে কারণে আমান এলিকে না করে দিয়েছিল, সেই একই কারণে এখন এলিকে দরকার আমানের। পঞ্চাশ বছর পর আমরা জানতে পারি, আমান তখন আরেকজনকে চেয়েছিল এ পদের জন্য, নাদিয়ার সেই বুদ্ধিজীবী ভাইকে! নাদিয়ার ভাই সামি না করে দেন, ইসরাইলে থেকে একজন বিখ্যাত কবি হন।

যাই হোক, এলিকে এ চাকরির জন্য কঠিন ট্রেনিংয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হলো। প্রতিদিন সকালে তিনি কিছু একটা অজুহাতে বের হতেন, তারপর রওনা দিতেন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ট্রেনিং সেন্টারের উদ্দেশ্যে। প্রথমে শিখলেন কীভাবে সবকিছু দ্রুত মুখস্থ করতে হয়। টেবিলে নানা রকম জিনিসপাতি রাখা হতো, এলি দুই-এক সেকেন্ড দেখার সুযোগ পেতেন, এরপর চোখ বন্ধ করে বলতে হতো কী কী দেখলেন। কোন যুদ্ধযানকে কী বলে, সেগুলোও শিখলেন।

তার একজন প্রশিক্ষক ছিলেন, নাম ইৎসহাক। ইৎসহাক বলতেন, "চলো হেঁটে আসি।" তারা রাস্তায় বের হবার পর এলিকে তিনি বলতেন, "ঐ পত্রিকার দোকানটা দেখছো? ওখানে গিয়ে পত্রিকা দেখার ভান করো, আর খুঁজে বের করো, কে তোমাকে অনুসরণ করছে।" ফিরে আসার পর তিনি রিপোর্ট চাইতেন। এলির সামনে অনেকগুলো ছবি রাখতেন, এলি বাছাই করে বলতেন, কে কে তাকে অনুসরণ করছে। অনেক সময়ই এলি শুরুতে মিস করে যেতেন কাউকে কাউকে।

এক সকালে জালমান এলিকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ইয়েহুদার সাথে, তিনি এলিকে শেখালেন কীভাবে রেডিও ট্রান্সমিটার ব্যবহার করতে হয়।

এরপর পালা শারীরিক কসরত আর অন্যান্য পরীক্ষার। সেগুলো শেষ হলে জালমান এলিকে পরিচয় করিয়ে দিলেন মারসেল কাজিন নামে এক নারীর সাথে।

"এটা তোমার শেষ পরীক্ষা, এলি," বললেন জালমান, "মারসেল তোমাকে এক মিসরীয় ইহুদীর ফরাসি পাসপোর্ট দেবে, যে কিনা আফ্রিকাতে অভিবাসী হয়েছে, এখন সে ইসরাইলে ঘুরতে এসেছে। এ পাসপোর্ট ব্যবহার করে তুমি জেরুজালেম যাবে এবং সেখানে দশদিন থাকবে। মারসেল তোমাকে তোমার কভার সম্পর্কে সবকিছু জানাবে, তোমার অতীত, তোমার এই পরিবার, তুমি আফ্রিকায় কী করো। জেরুজালেমে তুমি কেবল আরবি আর ফরাসিতে কথা বলতে পারবে, আর কিছু না। তুমি তোমার আসল পরিচয় প্রকাশ না করে সেখানে মানুষের সাথে মিশবে, নতুন বন্ধু বানাবে। আর নিশ্চিত করবে যেন কেউ তোমাকে অনুসরণ করতে না পারে।"

এলি জেরুজালেমে দশদিন কাটালেন। ফিরে আসার পর এলির কয়েকদিনের ছুটি জুটলো। নাদিয়া এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, নাম রাখা হয়েছে সোফি।

ইহুদী নববর্ষ রশ হাসানায় জালমান এলিকে দুজন লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তবে তারা তার পরিচয় দিলেন না। এদের মধ্যে একজন হেসে বললেন, "এলি, তুমি তোমার জেরুজালেম পরীক্ষায় পাশ করেছো। এবার আসল কাজে যোগ দিতে হবে।"

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শূন্য একটি কক্ষে, এলির সাথে বসানো হলো একজন মুসলিম শেখকে, অন্তত এলি তাকে মুসলিম হিসেবেই জানলেন। তিনি তাকে ধৈর্যের সাথে কুরআন আর নামাজ শিক্ষা দিতে লাগলেন। এলি খুব মনোযোগ দিয়ে শিখতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বারবার ভুল করতে লাগলেন।

তার প্রশিক্ষকেরা সান্ত্বনা দিলেন, "সমস্যা নেই, কেউ যদি বলে এগুলো কেন পারো না, তাহলে বলবে তুমি খুব একটা ধার্মিক মুসলিম নও, ছোট বেলায় ধর্মীয় যা যা শিখেছিলে তা আবছা আবছা মনে আছে।"

এলিকে বলা হলো, তাকে একটি নিরপেক্ষ দেশে পাঠানো হবে প্রথমে, সেখানে আরও পরিপক্ব হবার পর তাকে কোনো আরব দেশের রাজধানীতে স্পাই হিসেবে পাঠানো হবে।

"কোন দেশ?" জিজ্ঞেস করলেন এলি কোহেন।

উত্তর এলো, "যথাসময়ে জানানো হবে।"

জালমান আরও বললেন, "তবে যেখানে যাবে সেখানে আরব সেজে যাবে, স্থানীয় লোকদের সাথে মিশবে, আর ইসরাইলি স্পাই নেটওয়ার্ক তৈরি করবে।"

এলি সাথে সাথে রাজি হলেন। তার আত্মবিশ্বাস আছে, তিনি পারবেন কাজটা করতে। তার সাথে হ্যান্ডলারদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। হ্যান্ডলার হলো একজন স্পাইয়ের ম্যানেজার, যার মাধ্যমে সে নির্দেশনা পাবে।

হ্যান্ডলাররা জানালো, "তোমাকে একজন সিরীয় বা ইরাকির পাসপোর্ট দেয়া হবে।"

"কেন? আমি তো ইরাক নিয়ে কিছুই জানি না। আমাকে মিসরীয় পাসপোর্ট দিন বরং।"

"অসম্ভব," জালমান বললেন, "মিসরীয়রা তাদের জনসংখ্যার আপডেটেড রিপোর্ট রেখেছে, সকল পাসপোর্টের রেকর্ড আছে তাদের কাছে। খুব বিপজ্জনক হবে ব্যাপারটা। ইরাক আর সিরিয়ার এমন রেকর্ড নেই, তারা তোমাকে ট্র্যাক করতে পারবে না।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুই দিন পর তারা এলি কোহেনকে নতুন পরিচয় হস্তান্তর করেন। "তোমার নাম কামেল, তোমার বাবার নাম আমিন সাবেত। তাই তোমার পুরো নাম কামাল আমিন সাবেত।"

এলির উর্ধ্বতনরা তাকে কামেল আমিন সাবেতের অতীত শিখিয়ে দিলেন, এটা হবে তার কভার স্টোরি। "তুমি সিরীয় বাবা-মার সন্তান। তোমার বয়স যখন মাত্র তিন, তোমার পরিবার লেবানন ছেড়ে মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়ায় চলে যায়। তোমার বাবা ছিলেন টেক্সটাইল ব্যবসায়ী। ১৯৪৬ সালে তোমার চাচা আর্জেন্টিনায় অভিবাসন নেন। এর কিছুদিন পর, তোমার সেই চাচা তোমার বাবাকে চিঠি লিখে তোমার পরিবারের সবাইকে রাজধানী বুয়েনস আয়রেসে আমন্ত্রণ করেন। তোমার বাবা আর চাচা সেখানে এক ভদ্রলোকের সাথে ব্যবসায়িক চুক্তিতে যান, একটা টেক্সটাইলের দোকান খোলেন। কিন্তু ক'দিন পর দেউলিয়া হয়ে গেলেন। তোমার বাবা ১৯৫৬ সালে মারা যান, তার ছয় মাস পর মারা যান তোমার মা। তুমি তোমার চাচার সাথে থাকতে, কাজ করতে একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে। পরে একটা সময় তুমি নিজে ব্যবসা দিলে, আর খুব সফল হয়ে গেলে।"

এলিকে তার নিজের পরিবারের জন্যও কভার স্টোরি শিখিয়ে দেয়া হলো, সে অনুযায়ীই নাদিয়াকে বললেন তিনি, "আমি প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে জড়িত একটি কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছি। তাদের এমন কাউকে দরকার, যে কিনা ইউরোপে গিয়ে ইসরাইলের মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি তা'আসের জন্য কেনাকাটা করবে আর নতুন মার্কেট খুঁজবে। আমি দীর্ঘদিন পরপর বাসায় আসতে পারব। আমি জানি এটা আমাদের দুজনের জন্যই কষ্টের হবে, কিন্তু তারপরও আমাদের জন্য ব্যাপারটা ভালই হবে। তুমি আমার হয়ে পুরো বেতন পাবে এখানে। কয়েক বছরের মধ্যে আমরা নতুন আসবাবপত্র কিনে ইউরোপে থিতু হয়ে যাব।"

১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নাম্বারপ্লেট ছাড়া একটি গাড়ি এলিকে নিয়ে এলো লোদ বিমানবন্দরে। গিডিয়ন নামের এক তরুণ তাকে এলি কোহেন নামের ইসরাইলি পাসপোর্ট, জুরিখগামী টিকেট আর ৫০০ মার্কিন ডলার ধরিয়ে দিল।

তৎকালীন লোদ এয়ারপোর্ট

জুরিখে নেমে, এলির সাথে দেখা হলো সাদাচুলো এক লোকের, তিনি তার কাছ থেকে ইসরাইলি পাসপোর্ট নিয়ে নিলেন, আর এর বদলে তাকে একটি ইউরোপীয় পাসপোর্ট অন্য একটি নামে দিলেন। সেই পাসপোর্টে চিলিতে প্রবেশ ভিসা আছে আর আর্জেন্টিনার জন্য আছে ট্রানজিট ভিসা।

ভদ্রলোক বললেন, "বুয়েনস আয়রেসে আমাদের লোক তোমার ট্রানজিট ভিসার সময় বাড়িয়ে দেবে।"

তিনি তার হাতে টিকেট ধরিয়ে দিলেন, বললেন, "আগামীকাল তুমি বুয়েনস আয়রেসে অবতরণ করবে। তার পরদিন সকাল এগারোটায় তুমি করিয়েন্তেস ক্যাফেতে যাবে। আমাদের লোকেরা তোমার সাথে ওখানে দেখা করবে।"

পরদিন এলি আর্জেন্টিনার রাজধানীতে নামলেন, চেক-ইন করলেন একটি হোটেলে।

এরপরের দিন ঠিক সকাল এগারোটায় এলি হাজির করিয়েন্তেস ক্যাফেতে। এক বয়স্ক লোক তার সাথে দেখা করে নিজেকে আব্রাহাম নামে পরিচয় দিলেন। কোহেনের জন্য আগে থেকেই ভাড়া বাসা ঠিক করা আছে, আসবাবপত্রও প্রস্তুত। তিনি সেখানে উঠে যেতে পারেন।

এলি জানতে পারলেন, স্থানীয় এক শিক্ষিকা তার সাথে দেখা করবেন, তার কাছ থেকে স্প্যানিশ শিখতে হবে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

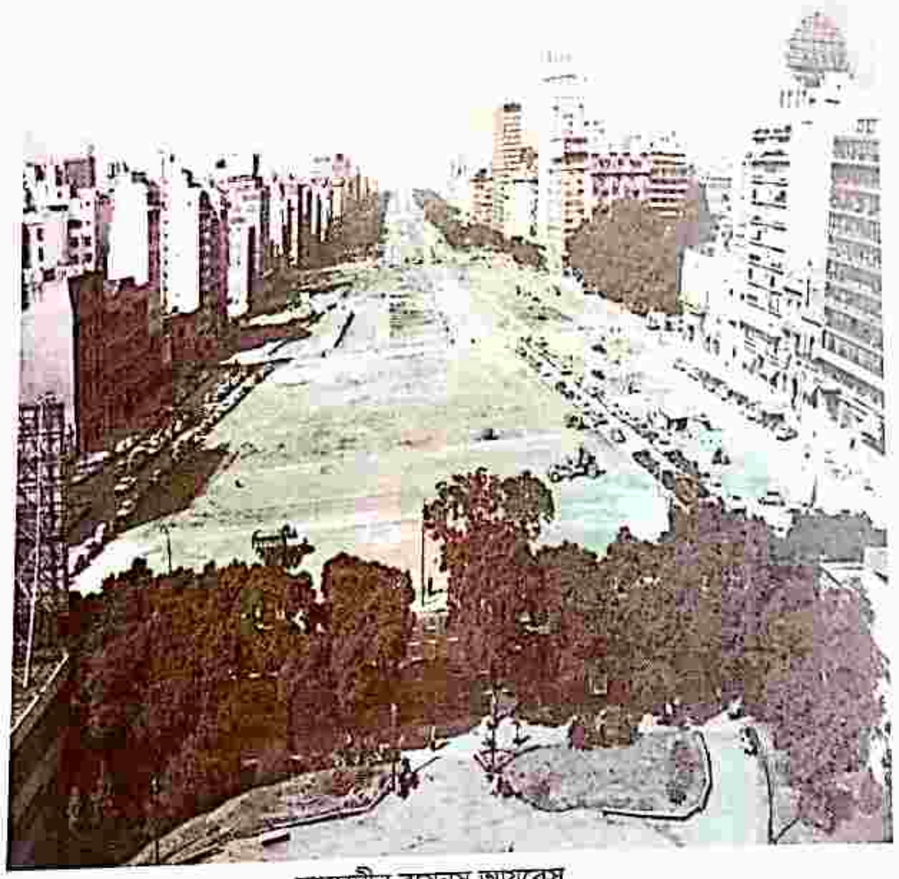

তৎকালীন বুয়েনস আয়রেস

"টাকা-পয়সা নিয়ে ভাববে না," অব্রাহাম জানালেন, "আমি ওসব ব্যবস্থা করে দেব। তুমি তোমার কাজ করো কেবল।"

তিন মাস পর, এলি পরের ধাপের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কাজ চালানোর মতো স্প্যানিশ পারেন এখন তিনি। বুয়েনস আয়রেস একদম হাতের তালুর মতো চেনা, পোশাক-আশাক দেখে তাকে আর আট দশজন আর্জেন্টাইন আরবের থেকে আলাদা করাই যাবে না। আরেকজন শিক্ষক তাকে সিরীয় অ্যাক্সেন্টে আরবি বলা শেখালেন।

সেই ক্যাফেতে আবারও দেখা হলো অব্রাহামের সাথে। তিনি এবার তাকে কামেল আমিন সাবেত নামের সিরীয় পাসপোর্ট ধরিয়ে দিলেন। বললেন, "এ সপ্তাহের মাঝে তোমার ঠিকানা বদলাও। একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলো এ নামে। এখন থেকে আরব রেস্তোরাঁতে বেশি যাও, আরবি মুভি দেখানো সিনেমা হলে যাও, আরব সংস্কৃতির সাথে মেশো। আরবদের রাজনৈতিক ক্লাবগুলোতে যাওয়া-আসা

শুরু করো। যত বেশি সম্ভব বন্ধু বানাও, আরব নেতাদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলো। তুমি আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে জড়িত। আরব কমিউনিটিতে দান খয়রাত করে নাম কামাও। শুভ কামনা রইলো তোমার জন্য।"

সৌভাগ্যের কমতি ছিল না ইসরাইলি স্পাই এলি কোহেনের। না, তিনি এখন আর এলি কোহেন নন, তার নাম কামেল আমিন সাবেত।

জনে জনে আরব লোকেরা তার বন্ধু বনে যেতে লাগলো। বিশেষ করে আরব নেতা আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা তো কামেল বলতে অজ্ঞান। তার সৌভাগ্যের সূচনা হলো এক সন্ধ্যায় এক মুসলিম ক্লাবে— সেখানে তার সাথে দেখা এক পরিপাটি ভদ্রলোকের, টাক হয়ে আসছে মাথা, পুরু গোঁফ মুখে। নিজের পরিচয় দিলেন তিনি, নাম তার আব্দেল লতিফ হাসান। তিনি এখানকার আরব ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনের সম্পাদক। তিনি এই সিরীয় অভিবাসী কামেল আমিন সাবেতের কথাবার্তায় এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হলেন।

দিনকে দিন তার আরও লোকের সাথে পরিচয় হতে লাগলো। দূতাবাসের এক পার্টির নিমন্ত্রণে গিয়ে এলির সাথে দেখা হলো সিরীয় এক জেনারেলের। বন্ধু লতিফ হাসান জেনারেলকে এলি তথা কামেলের পরিচয় দিলেন এভাবে, "আমি এখন আপনার সাথে একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমীর পরিচয় করিয়ে দিই।" এরপর এলির দিকে ফিরে বললেন, "ইনি জেনারেল আমিন আল-হাফেজ, দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাশে।"

এই লোকের সাথে সখ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে এলি তার শেষ পরীক্ষায় পাশ করে গেলেন। এবার আসল মিশনের পালা।

১৯৬১ সালের জুলাইতে অব্রাহামের সাথে দেখা করলেন এলি। সেখানে তিনি তার কাছ থেকে মিশনের ব্রিফিং পেলেন।

পরদিন লতিফ হাসানের অফিসে গেলেন এলি, তাকে বললেন, "আমার আর আর্জেন্টিনায় থাকতে ভালো লাগছে না। আমি বিরক্ত।"

এলি বললেন, তিনি সিরিয়াকে ভালোবাসেন, তিনি সেখানে ফেরত যেতে চান যে করেই হোক। হাসান কি তাকে কিছু লেটার অফ রিকমেন্ডেশন যোগাড় করে দিতে পারেন?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাসান সাথে সাথেই চারখানা লেটার যোগাড় করে দিলেন। একটা আলেক্সান্দ্রিয়াতে তার শ্যালকের কাছ থেকে; দুটো বৈরুতের দুই বন্ধুর কাছ থেকে, যার মাঝে একজন বেশ হোমড়া চোমড়া ব্যাংকার; আর চতুর্থ লেটার দামেস্কে তার ছেলের কাছ থেকে।

এলি তার আরব বন্ধুদের কাছেও ঘুরে এলেন, সবার কাছ থেকে এতগুলো লেটার যোগাড় করলেন তিনি যে, তার ব্রিফকেস ভরে গেল বুয়েনস আয়রেসের আরব নেতাদের রিকমেন্ডেশনে।

১৯৬১ সালের জুলাইয়ের শেষ দিকে, কামেল আমিন সাবেত জুরিখে উড়ে গেলেন, সেখানে প্লেন বদলে মিউনিখের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

ব্যাভারিয়ার রাজধানীতে অবতরণের পর এক ইসরাইলি এজেন্ট তার সাথে দেখা করলেন, নাম তার জেলিঙ্গার। জেলিঙ্গার এলির হাতে ইসরাইলি পাসপোর্ট ধরিয়ে দিলেন, আর সাথে তেলআবিব যাবার টিকেট।

এলি ফিরে এলেন ইসরাইলে। নাদিয়াকে বললেন, "আমি কয়েক মাস কাটাবো তোমার সাথে।"

নাদিয়া আর এলি কোহেন

পরের মাসগুলো তার কেটে গেল কঠিন প্রশিক্ষণে। তার পুরনো প্রশিক্ষক ইয়েহুদা তাকে আরও ভাল করে শেখালেন রেডিও ট্রান্সমিশন। কয়েক সপ্তাহের মাঝেই তিনি মিনিটে বারো থেকে ষোলটি শব্দ পাঠাতে শিখে গেলেন। সিরিয়ার ওপর বইয়ের পর বই আর নানা ডকুমেন্ট পড়তে লাগলেন তিনি। সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও নিজেকে অভিজ্ঞ করে তুললেন।

১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি জুরিখে গেলেন আবার। সেখান থেকে তার গন্তব্য সিরিয়ার রাজধানী, দামেস্ক।

সিরিয়া আর ইসরাইলের সীমান্তে সবসময়ই তখন উত্তেজনা বিরাজ করে। ১৯৪৮ সালের পর বেশ কিছু মিলিটারি ক্যু হয়ে গিয়েছে দেশটিতে। সিরিয়ান একনায়কদের স্বাভাবিক মৃত্যুর নজির আপাতত কম; যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন পর্যন্ত হয় তাদের মৃত্যু ফাঁসিকাষ্ঠে হচ্ছে, নয়তো ফায়ারিং স্কোয়াডে, কিংবা গুপ্তঘাতকের হাতে। মোট কথা, দেশজুড়ে তখন অরাজকতা। দামেস্কে প্রায়ই উন্মুক্তভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সিরিয়ার বিরোধীদের, সিরিয়ার ভেতরে অবস্থানকারী স্পাইদের সবসময়ই মৃত্যুভয় নিয়ে থাকতে হয়। এরকম এক অবস্থায় এলির আগমন সিরিয়ায়।

আসার আগে জালমান বলে দিয়েছেন, "জেলিঙ্গার তোমাকে রেডিও ট্রান্সমিটার দেবে। তুমি দামেস্কে আসার পর সিরিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের একজনের সাথে তোমার দেখা হবে। সে তোমার আসল পরিচয় জানে না, তার সাথে যোগাযোগ করবে না। সেও তোমার মতো 'অভিবাসী', কদিন আগে সিরিয়া এসেছে। যখন তোমার দরকার, তখন সে তোমার সাথে দেখা করবে।"

জেলিঙ্গার মিউনিখে আসলেই তাকে এক প্যাকেজ ভর্তি স্পাই যন্ত্রপাতি দিয়েছে। অদৃশ্য কালিতে লেখা ট্রান্সমিশন কোড, ট্রান্সমিশন কোড হিসেবে ব্যবহারের জন্য বই, বিশেষ টাইপরাইটার, একটি ট্রানজিস্টর রেডিও, যার ভেতরে ট্রান্সমিটার আছে, সাবান আর সিগারের ভেতর ভরা ডাইনামাইট, আর যদি লাগে, আত্মহত্যার জন্য সায়ানাইড পিল।

এলি চিন্তিত যে সিরিয়ার সীমান্তে কী করে এসব যন্ত্র নিয়ে পার হবেন। জেলিঙ্গার শিখিয়ে দিলেন, "জেনোয়া থেকে বৈরুতগামী এসএস অ্যাস্টোরিয়া

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জাহাজে করে চলে যাও; সেখানে একজন তোমার সাথে দেখা করবে, সে তোমাকে সাহায্য করবে সিরিয়ার সীমান্ত পার হতে।

এলি সেই জাহাজে উঠে পড়লেন। এক সকালে মিসরীয় ভ্রমণকারীদের পাশে বসে আছেন তিনি, তখন এক লোক তার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "আমাকে অনুসরণ করুন।"

একটু দূরে যাবার পর তিনি বললেন, "আমার নাম মজিদ শেখ আল-আর্দ। আমার গাড়ি আছে একটা।" তার মানে তিনি দামেস্ক পর্যন্ত এলিকে নিয়ে যাবেন।

এলি জানতে পারলেন, ছোট খাট দেখতে এই মজিদ শেখ দামেস্কের একজন ব্যবসায়ী, তিনি মিসরের এক ইহুদী নারীকে বিয়ে করেন। তিনি নিজেও জানেন না তিনি আসলে ইসরাইলের হয়ে কাজ করছেন, তার ধারণা তিনি সিরিয়ার ডানপন্থীদের হয়ে আন্ডারকভার কাজ করছেন। তিনি সত্যি সত্যি কামেল আমিন সাবেতের গল্পে বিশ্বাস করলেন, পরবর্তী বছরগুলোতে অনেক সাহায্য করেছিলেন।

আপাতত প্রথম যে সাহায্য তিনি করবেন তা হলো, কামেলের জিনিসপাতি যেন নিরাপদে দামেস্কে পৌছায়।

১৯৬২ সালের ১০ জানুয়ারি মজিদ শেখের গাড়ি সীমান্তে থামানো হলো। এলি বসে আছেন মজিদের পাশে, আর ট্রাংকে ব্যাগ বোঝাই স্পাই যন্ত্রপাতি।

মজিদ শেখ এলিকে শিখিয়ে দিলেন, "আমরা এখানে দেখা করব বন্ধু আবু খালদুনের সাথে, তার টাকা পয়সার সমস্যা চলছে। ৫০০ ডলার দিলেই তার কষ্ট দূর হবে নিশ্চিতভাবে।"

আবু খালদুনের পকেটে ৫০০ টাকা ঘুষ ঢুকিয়ে দিয়ে কোহেন সিরিয়ায় প্রবেশ করতে পারলেন।

সিরিয়ায় এসে তার প্রথম কাজ, উচ্চপদস্থ লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তিনি বিলাসবহুল এক ভিলা ভাড়া করলেন দামী আবু রামেন এলাকায়। কাছেই সিরীয় আর্মির হেডকোয়ার্টার। সেখান থেকে তিনি নজর রাখতে পারেন কে আসছে যাচ্ছে আর্মির হেডকোয়ার্টারে। বাসায় ঢুকেই তিনি ঘরজুড়ে নানা জায়গায় তার যন্ত্রপাতি লুকিয়ে রাখলেন। ঝুঁকি এড়াতে কাজের লোকও রাখেননি।

রাশিয়ার রিলিজ করা এ ছবিতে আর্মি হেডকোয়ার্টারের পাশে এলি কোহেনকে দেখা যাচ্ছে দামেস্ক শহরে, কাছেই তার ভিলা

ভাগ্য তার সহায়। একদম মোক্ষম মুহূর্তে কামেল আমিন সাবেত সিরিয়ায় পা দিয়েছেন। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব জর্জরিত সিরিয়ার কারও তখন ইসরাইলি স্পাই নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। সবাই ভাবছে, শীঘ্রই হয়তো একটি ক্যু হতে চলেছে। তবে এই রাজনীতিবিদদের টাকা-পয়সার দরকার। আর টাকা ভালোই আছে ব্যবসায়ী কামেল আমিন সাবেতের। ব্রিফকেস বোঝাই গণ্যমান্যদের রিকমেন্ডেশন লেটার তার।

কোহেন খুব দ্রুত ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, তার লেটারগুলো খুবই কাজে দিল। উচ্চবিত্ত সমাজ, ব্যাংক আর ব্যবসায়িক বলয়ে তার নাম ছড়িয়ে পড়লো। এমনও হয়েছে, দুই ধনী লোক চাইতেন তাদের মেয়েকে বিয়ে করুক এলি। কামেল বড়সড় দান-খয়রাতও করলেন।

দামেস্কে আসার এক মাস পর তার সাথে দেখা হলো জর্জ সালেম সাইফের। এর কথাই জালমান বলেছিলেন তার ব্রিফে। জর্জ পেশায় এখানকার একজন রেডিও শো'র উপস্থাপক বা আরজে। তিনি অনেক কিছুই জানেন যা অন্য লোকে জানে না। সেগুলো তিনি কামেলকে জানাতে লাগলেন। জর্জের বাসার পার্টিতে তিনি সিনিয়র অফিশিয়ালদের সাথে পরিচিত হলেন, অনেক রাজনীতিবিদের সাথেও দেখা হলো।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবশ্য, জর্জেরও জানা নেই এলি কোহেনের ব্যাপারে। তিনি কেবল কামেল আমিন সাবেতকে চেনেন। পৃথিবীর সবচেয়ে একা স্পাইতে পরিণত হলেন কামেল। তার আসল পরিচয় জানা কোনো লোক নেই এখানে। তিনি জানেন না এখানে আরও কোনো ইসরাইলি স্পাই নেটওয়ার্ক আছে কিনা। আর ইসরাইলে তিনি নিজ স্ত্রীকেও কিছু বলতে পারেন না।

প্রতি রাত আটটার দিকে তিনি ইসরাইলে মেসেজ পাঠান। তার ভিলা যেখানে, এর পাশেই আর্মিদের সদর দপ্তর হওয়ায় প্রায় সারাক্ষণই এখান থেকে মেসেজ যাচ্ছে, তাই কামেলের মেসেজ সিগনাল আলাদা করে সন্দেহ জাগাবে না। ছয় মাস পর্যন্ত এভাবেই চলতে লাগলো।

ছয় মাস বাদে তিনি সবাইকে জানালেন, তিনি একটু দেশের বাইরে যাবেন। গেলেনও, তবে আর্জেন্টিনায়, ইসরাইলে নয়। আর্জেন্টিনায় পুরাতন বন্ধুদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করে তিনি ইউরোপে গেলেন। সেখানে পাসপোর্ট আর বিমান পরিবর্তন করে তিনি ইসরাইলের লোদ বিমানবন্দরে নামলেন। অসংখ্য উপহার নিয়ে তিনি তেলআবিবে, বাসায় ফিরলেন।

ইউরোপে ফেরার সময় হয়ে এলো এলি কোহেনের। আবারও তাকে হতে হবে কামেল আমিন সাবেত।

কাজের ডাকে তিনি ফিরে গেলেন ইউরোপ হয়ে দামেস্কে। তবে এবার ইসরাইল থেকে তিনি সহকর্মীদের দেয়া অত্যাধুনিক ক্যামেরা নিয়ে এলেন। এগুলো দিয়ে তাকে স্পর্শকাতর ডকুমেন্ট আর জায়গার ছবি তুলতে হবে। দামী বাক্সে করে লুকিয়ে আনতে হলো মাইক্রোফিল্মগুলো। বলা হলো, এই দামী জিনিসগুলো আর্জেন্টাইন বন্ধুদের জন্য উপহার।

এলির কাছে মনে হলো বর্তমান সরকার টিকবে না, তাই তিনি উদীয়মান বাথ পার্টির লোকদের সাথে সখ্যতা গড়তে লাগলেন।

তিনি ঠিকই করেছিলেন। ১৯৬৩ সালের ৮ মার্চ দামেস্কে আবারও ক্যু হলো। আর্মি সরকারকে হটিয়ে দিল, এর বদলে ক্ষমতা হাতে নিল বাথ পার্টি। বুয়েনস আয়রেসে যেই জেনারেল হাফিজের সাথে দেখা হয়েছিল কামেলের, তিনি হলেন নতুন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

কয়েক মাস পর জুলাইতেই আরেকটি ক্যু হলো। এবার জেনারেল হাফিজ নিজেই ক্ষমতা দখল করে নিলেন। সাবেতের গণ্যমান্য বন্ধুরা কেবিনেট আর মিলিটারির গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো পেলেন।

ইসরাইলি স্পাই এলি কোহেন তখন সিরীয় সরকারের ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

কামেল আমিন সাবেতের ভিলায় জমকালো পার্টি হচ্ছে। একের পর এক মন্ত্রী আর জেনারেলদের গাড়ি এসে ভিড়ছে, নেমে আসছেন তারা। পার্টিতে জেনারেল সেলিম হাতুমও আছেন, যিনি অভিযান চালিয়ে জেনারেল হাফিজকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট হাফিজ নিজেই এলেন কিছুক্ষণ বাদে, এসে কামেলের সাথে করমর্দন করলেন। তার সাথে মিসেস হাফিজও আছেন, পরনে কামেলেরই দেয়া দামী কোট। কেবল মিসেস হাফিজই নন, অনেকেই এখানে কামেলের দেয়া উপহার পরিধান করে আছেন।

প্রেসিডেন্ট হাফিজের সাথে এলি কোহেন

লিভিং রুমে আর্মি অফিসাররা বসে আলাপ করছেন, তারা মাত্রই ইসরাইল সীমান্ত থেকে ফিরেছেন। সেখানে জর্ডান নদীর গতিপথ পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজ চলছে। তাই এ আলোচনায় ইঞ্জিনিয়াররাও আছেন। আছে রেডিও দামেস্কের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ডিরেক্টররাও. কামেল নিজেও এখন কাজ করছেন রেডিওতে। সেখানে তিনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন।

এরকম পার্টিগুলোতে কামেলের অনেক টাকা খরচ হয়, কিন্তু তিনি এতে গা করেন না। তিনি এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছেন, যেখান থেকে তাকে সরানো যাবে না। বাথ পার্টিতেও তার ভালো সম্পর্ক, আবার আর্মিতেও অনেক বন্ধু।

তাকে আর পায় কে?

এলি মিলিটারির গুরুত্বপূর্ণ লোকদের নাম পরিচয় আর আলাপগুলো ইসরাইলে পাঠাতে লাগলেন রোজ নিয়ম করে। খুবই গোপন সব সামরিক মানচিত্র, ইসরাইলি সীমানা বরাবর স্থাপন করতে চলা নতুন সুরক্ষার নীলনকশা, সিরিয়ার হাতে আসা নতুন অস্ত্রসবই কামেল ইসরাইলে পাঠাতে থাকলেন।

হেডকোয়ার্টারের ছত্রছায়ায় থাকায় কামেলের ধরা পড়ার ভয়-ডর ছিল না। তিনি প্রত্যেকদিন সকালেও মেসেজ পাঠাতেন। একদিন সকাল সকাল লেফটেন্যান্ট জাহির আল-দ্বিন হঠাৎ তার ভিলায় আসলেন। কামেল ট্রান্সমিটার লুকানোর সময় পেলেও, কাগজের ওপর লেখা গোপন কোডগুলো লুকাবার সময় পাননি। সেটা টেবিলের ওপর দেখে ফেলেন জাহির।

"এসব কী?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"আরে, তেমন কিছু না। ক্রসওয়ার্ড পাজল খেলি তো," বললেন কামেল।

কামেল আরেকটি অভিনব উপায়ে ইসরাইলের সাথে সংবাদ বিনিময়ের উপায় বের করলেন। তিনি রেডিওতে গোপন সব শব্দ আর কোড বলতে লাগলেন যেগুলো কেবল ইসরাইলে তার অফিসই বের করতে পারবে।

তিনি গোপন তথ্য বের করবার জন্য আরেকটি রাস্তা ঠিক করলেন। গুজব ছড়িয়ে দিলেন, কামেল আমিন সাবেতের ভিলাতে উদ্দাম সেক্স পার্টি হয়। সেখানে দলে দলে সুন্দরী নারীদের খোঁজ পাওয়া যায়। সবাই দাওয়াত পায় না, কেবল তার ঘনিষ্ঠজনেরা পায়। সবাই তাই তার সেক্স পার্টিতে আমন্ত্রণ পেতে আগ্রহী। এর মাঝে একজন ছিলেন কর্নেল সেলিম হাতুম, তার সাথে যাওয়া নারী হাতুমের প্রতিটি কথা কামেলকে এসে জানায়।

কামেল যখনই ইসরাইলের কথা বলেন, তখনই ইসরাইলের নামে বিষেদগার করতে ছাড়েন নাড়ইসরাইল আরব জাতীয়তাবাদের নিকৃষ্টতম শত্রু। তিনি তার মিলিটারি বন্ধুদের উত্যক্ত করতে বললেন, সিরিয়া কিছুই করছে না ইসরাইলের বিরুদ্ধে। তার কথাকে ভুল প্রমাণিত করতে, কামেলকে চার বার নিয়ে যাওয়া হলো সিরিয়া-ইসরাইল সীমান্তে। সেখানে তিনি বিস্তারিতভাবে দেখে এলেন কী কী সুরক্ষানীতি নিশ্চিত করা হচ্ছে। কী কী অস্ত্র সেখানে মজুদ করা হচ্ছে।

আর এ সবই কামেল তথা এলি কোহেন পাচার করে দিতেন ইসরাইলে।

গোলান হাইটসে এলি কোহেন

১৯৬৩ সালের কথা।

ইসরাইলে মোসাদের নতুন রামসাদ (মোসাদ-প্রধান) মেইর আমিত কয়েক মাস ধরে আমান আর মোসাদ দুটোই চালাচ্ছেন। তিনি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন, আমানের ইউনিট ১৩১ ভেঙে সেখানের সব কর্মীকে মোসাদে নিয়ে আসবেন।

এক সকালে উঠে, এলি কোহেন জানতেন পারলেন, তিনি আর আমান কর্মী নন। তিনি এখন অফিশিয়ালি মোসাদ এজেন্ট।

একই বছর নাদিয়া দ্বিতীয় কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন।

আর ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে, ইসরাইলে দ্বিতীয়বারের মতো এলেন এলি কোহেন। তার স্বপ্ন পূরণ হলো– তৃতীয় সন্তান হলো। এবার পুত্রসন্তান, নাম রাখা হলো শাউল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তার পরিবারের সদস্যরা বলেন, "সেবার এলি আসার পর তার কথাবার্তায় বড় পরিবর্তন দেখতে পাই আমরা, আগের মতো আত্মবিশ্বাসী নয় আর। অনেকবার রেগে গেল। বাইরে যেতে চায়নি সে, বন্ধুদের সাথে দেখাও করেনি। বারবার বলতো, চাকরি ছেড়ে দেবে, পরেরবার ইসরাইলে এলে আর ফিরে যাবে না।"

নভেম্বরের শেষে এলি তার স্ত্রীকে চুম্বন করলেন, তিন ছেলে মেয়েকে বিদায় জানালেন। বিমানে ওঠার সময়ও এলি জানতেন না, এটাই ছিল তার শেষ বিদায়।

এলি কোহেনের পারিবারিক ছবি, তার নিজের সন্তানরা এ ছবিতে আছে, সাথে অন্য বাচ্চারা

১৯৬৪ সালের নভেম্বরের ১৩ তারিখ। বুধবার।

সিরিয়া থেকে ইসরাইলের বেসামরিক অঞ্চলে ইসরাইলি ট্রাক্টরের ওপর গুলি ছোঁড়া হলো। ইসরাইল পালটা জবাব দিল ভারী গোলাবর্ষণের মাধ্যমে। ইসরাইলের যুদ্ধবিমান জর্ডান নদীর গতিপথ পরিবর্তনের জায়গায় বোমা ফেলল। সিরিয়ার বিমান বাহিনী পাল্টা উত্তর দিল না, রাশিয়ার কাছ থেকে পাওয়া মিগ বিমান চালনায় এখনও পারদর্শী হয়ে ওঠেনি তারা।

বিশ্বের সংবাদমাধ্যমগুলো ইসরাইলের পক্ষে অবস্থান নিল। তারা জানতো না, এই আক্রমণের পেছনে এলি কোহেন আছেন। তার কারণেই ইসরাইলিরা জানতো, সিরিয়ার বিমান বাহিনীর অবস্থা করুণ, তারা পাল্টা আক্রমণ করতে পারবে না। ইসরাইলিরা জানতো কোন জায়গায় কী অস্ত্র আছে, আর কোথায় কী নেই।

এলি কোহেন আরও অনেক কিছু জানতেন। তিনি এক সৌদি ব্যবসায়ীর সাথে বন্ধুত্ব করেছেন, তার নাম বিন লাদেন। তার শিশুপুত্রের নাম ওসামা। তার মারফতেই কামেল জানতে পারলেন ঠিক কোথায় সিরিয়া গোপন প্রজেক্ট করছে, কোথায় খাল খুঁড়ছে, কী কী যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি জানতেন কোথায় কীভাবে আক্রমণ করলে দুর্বল জায়গা ভেঙে পড়বে। বিন লাদেন জানতেন না, তিনি এক ইসরাইলি স্পাইয়ের কাছে কথাগুলো বলছেন, সিরীয় ব্যবসায়ী নয়। বিন লাদেনের অনিচ্ছাকৃত সাহায্যের কল্যাণে ইসরাইল কয়েকবার আক্রমণ চালায় এ প্রজেক্টে। শেষমেশ ১৯৬৫ সালে বাতিল হয় এ প্রজেক্ট।

১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে, নাদিয়া কোহেনের কাছে এক পোস্টকার্ড এলো। এলি ফ্রেঞ্চ ভাষায় লিখেছেন—

প্রিয় নাদিয়া,

শুভ নববর্ষ। এ বছর আমাদের পুরো পরিবারের ওপর শান্তি বয়ে আনুক। ফিফি (সোফি), আইরিস আর শাইকেহ (শাউল)—আমার বাচ্চাগুলোর জন্য অনেক চুমু আর ভালোবাসা রইলো আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে। তোমার জন্যও।

এলি।

এ পোস্টকার্ড যখন নাদিয়ার হাতে পৌঁছালো, তখন এলি দামেস্কের জেলের মেঝেতে জর্জরিত হয়ে পড়ে আছেন।

সিরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা মুখাবারাত বেশ কয়েক মাস ধরে সতর্ক অবস্থায় আছে। তারা খেয়াল করেছে, সন্ধ্যা বা রাতে নেয়া সিরীয় সরকারের গোপন সিদ্ধান্ত কীভাবে যেন পরদিন ইসরাইলের আরবি ভাষী রেডিওতে প্রচারিত হয়!

তার মানে কেউ একজন তাদের মাঝেই আছে, যে কিনা সব খবর নিখুঁতভাবে ইসরাইলে পাঠাচ্ছে। বিশেষ করে ১৩ নভেম্বর যেভাবে ইসরাইল আক্রমণ চালালো,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা নিশ্চিতভাবেই জানতো কোথায় কোথায় আক্রমণ করতে হবে। খুব উচ্চ পর্যায়ের কেউ না হলে এগুলো জানারই কথা না।

আর যেহেতু এত দ্রুত খবর চলে যাচ্ছে, তার মানে তারহীনভাবেই পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু ট্রান্সমিটারটা কোথায়?

১৯৬৪ সাল থেকে তারা সোভিয়েত যন্ত্রের সাহায্যে চেষ্টা করছে ট্রান্সমিটার বের করার। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে এসে তাদের ভাগ্য খুলল।

সোভিয়েত থেকে নতুন যন্ত্রপাতি এলো, সেগুলো লাগানোর জন্য আগেরগুলো খুলতে হবে। এজন্য চব্বিশ ঘন্টা আর্মির সকল সিগনাল যোগাযোগ বন্ধ রাখা হলো।

সব বন্ধ হয়ে যাবার পরেও এক আর্মি অফিসার তার রিসিভারে ক্ষীণ সিগনাল পেলেন। সেই স্পাই এখন বার্তা পাঠাচ্ছে। সেই অফিসার সাথে সাথে এই খবর দিতে ফোন দিলেন।

গোয়েন্দা সংস্থা মুখাবারাতের স্কোয়াড সাথে সাথে রাশিয়ান যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তারা জায়গামত পৌঁছানোর আগেই থেমে গেল ট্রান্সমিশন। কিন্তু টেকনিশিয়ান তাও হিসেব করে জানালো, সিগনাল মনে হচ্ছে কামেল আমিন সাবেতের ভিলা থেকে আসছে।

সিনিয়র গোয়েন্দা অফিসার উড়িয়ে দিলেন কথাটা, "আরে, ভুল হচ্ছে কোনো।" কামেল কীভাবে স্পাই হবেন? তাকে তো মন্ত্রী করার চিন্তা করা হচ্ছে। তাকে সন্দেহের কিছু নেই।

সন্ধ্যা বেলায় আবার ট্রান্সমিশন দেখা দিল। সেই একই জায়গা থেকে।

সকাল আটটার সময় চারজন মুখাবারাত অফিসার দরজা ভেঙে ঢুকে গেলেন সেই ভিলায়। হাতে বন্দুক। গুপ্তচর এখানেই, মোটেও ঘুমন্ত না, ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে বার্তা পাঠানোতে ব্যস্ত।

কামেল উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু পালিয়ে গেলেন না, বাধাও দিলেন না। তার খেলা শেষ। এখান থেকে বের হবার উপায় নেই।

কমান্ডিং অফিসার চিৎকার করে বললেন, "কামেল আমিন সাবেত, তোমাকে গ্রেফতার করা হলো।"

এ খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো। কামেল? গুপ্তচর? কী আবোল-তাবোল কথা। আসলেই কি এটা হতে পারে?

কিন্তু তথ্য-প্রমাণ সবই বলছে, কামেল গুপ্তচর। জানালার পেছনে লুকানো ট্রান্সমিটার, ঝাড়বাতিতে লুকানো ট্রান্সমিটার, মাইক্রোফিল্ম, সিগারের ভেতরে ডাইনামাইট, কোডে ভরা পৃষ্ঠা... কোনো সন্দেহ নেই কামেল আমিন সাবেত একজন বিশ্বাসঘাতক, একজন গুপ্তচর।

দামেস্কের ইসরাইলি গুপ্তচর।

সরকারের সবাই ভয় পেলো। তারা তো অনেক কিছুই শেয়ার করেছে কামেলের সাথে। তারাও কি এখন বিপদে পড়বে?

জেনারেল হাফিজ স্বয়ং এলেন জিজ্ঞাসাবাদে। পরে তিনি বলেছিলেন, "জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমি যখন সাবেতের চোখের দিকে তাকালাম, আমার হঠাৎ প্রচণ্ড সন্দেহ হলো। আমার মনে হলো, এই লোক আরবই না। আমি তাকে কুরআন আর ইসলামের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করলাম। তাকে কুরআনের প্রথম সুরা অর্থাৎ সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতে বললাম। সে ওটাও পারলো না ঠিক মতো। একটু আমতা আমতা করার পর বলল, সে খুব ছোট বয়সে সিরিয়া থেকে চলে গিয়েছিল, তাই তার স্মৃতিতে নেই এগুলো। কিন্তু আমি তখন নিশ্চিত হয়ে গেলাম সাবেত আসলে ইহুদী।"

বাকি কাজ জেলের রিমান্ডকারীরাই সারলেন। রিমান্ডের এক পর্যায়ে কামেল আমিন সাবেত স্বীকার করলেন, তিনি সাবেত নন। তার নাম এলি কোহেন। তিনি একজন ইসরাইলি ইহুদী।

১৯৬৫ সালের ২৪ জানুয়ারি দামেস্ক থেকে অফিশিয়ালি ঘোষণা এলো, "একজন গুরুত্বপূর্ণ ইসরাইলি গুপ্তচর ধরা পড়েছে।" একজন অফিসার ক্রোধে বলে বসলেন, "ইসরাইল হলো শয়তান, আর কোহেন সেই শয়তানের দালাল!"

দামেস্ক জুড়ে তল্লাশি চলল। কোহেন কি একা? নাকি স্পাই নেটওয়ার্কের নেতা? একের পর এক লোকে ধরা পড়তে লাগলো, উনসত্তর জনকে গ্রেফতার করা হলো, এর মাঝে সাতাশজন নারী। সন্দেহভাজনদের মাঝে ছিলেন মজিদ শেখ আল-আর্দ, জর্জ সালেম সাইফ, লেফটেন্যান্ট জাহির উদ-দ্বীন, আর সেসব নারীরা, যাদেরকে পার্টিতে আনতেন কামেল। কামেলের সাথে চলা-ফেরা করা চারশ লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। দেখা গেল সরকারের উচ্চপদস্থরাই কামেলের বন্ধু, এদেরকে তো জিজ্ঞাসা করা যায় না। তাদের নামই মুখে আনা যাবে না।

ইসরাইলের মিডিয়াতে কোহেনের ব্যাপারে কোনো খবর দেয়া নিষিদ্ধ করা হলো। ইসরাইল তখনও আশা করছে, কোহেনকে বাঁচানো যাবে বুঝি। কিন্তু একদিন এলির ভাইয়ের কাছে এক লোক এসে বলল, "তোমার ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে দামেস্কে। অভিযোগ, সে ইসরাইলের গুপ্তচর।"

ভাইয়েরা তাজ্জব হয়ে গেলেন। তাদের একজন মায়ের কাছে গিয়ে বললেন, "মা, স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করো। এলিকে সিরিয়াতে গ্রেফতার করা হয়েছে।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এলির মা অবাক হয়ে গেলেন, "সিরিয়া? কীভাবে? ও কি ভুলে বর্ডার ক্রস করে ফেলেছে?" সেই ভাই যখন বুঝিয়ে বললেন ব্যাপারটা, তখন তিনি মূর্ছা গেলেন।

নাদিয়ার আগে থেকেই সন্দেহ ছিল। কিন্তু তিনিও নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলেন। এলির সহকর্মীরা তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। একজন বললেন, "আপনি চলুন প্যারিসে। আমাদের সেরা ল'ইয়ারকে আমরা ভাড়া করছি। আমাদের পক্ষে যা যা সম্ভব, সব করব আমরা এলিকে বাঁচাতে।"

রামসাদ মেইর আমিত স্বয়ং কোহেনকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।

জানুয়ারির ৩১ তারিখ ফ্রান্সের বিখ্যাত ল'ইয়ার জাক মার্সিয়া দামেস্ক এলেন। কাগজে-কলমে কোহেন পরিবার তাকে ভাড়া করেছে, কিন্তু আসলে ইসরাইল সরকার, তথা মোসাদ দিচ্ছে সব টাকা-পয়সা। সিরিয়াতে তিনি অসম্ভব কাজে এসেছেন। পরে তিনি বলেছিলেন, "প্রথম দিনেই আমি বুঝতে পারি, এলি কোহেনকে বাঁচানো সম্ভব না। তিনি মরবেনই। তাও আমি চেষ্টা করে গেলাম সেটা দেরি করাতে।"

প্রথমে মার্সিয়া চেষ্টা করলেন যেন কোনো ট্রায়াল না হয়। তিনি সিরিয়ার নেতাদের সাথে দেখা করে অনুরোধ করলেন। সবাই তার অনুরোধ না করে দিল। তবে হাফিজের শত্রুরা সায় দিলেন, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।

মিলিটারি কোর্টে বন্ধ-দরজা ট্রায়াল হলো। কেবল কিছু অংশবিশেষ দেখানো হলো টিভিতে। কেউ এলি কোহেনের পক্ষে ছিল না। কেউ তার পক্ষ নিয়ে কথা বলেনি। এলি কোহেন ল'ইয়ার চাইলে বিচারক চিৎকার করে বললেন, "তোমার পক্ষে কথা বলার কোনো লোক প্রয়োজন নেই। সকল দুর্নীতিবাজ সংবাদমাধ্যম তোমার পক্ষে।"

বাম পাশের প্রথমজন এলি কোহেন, তার বিচার চলছে

বিচারকদের মধ্যে তারই বন্ধুরা অবস্থান করছিলেন। যেমন কর্নেল সালিম হাতুম যেকোনো গুজব দূর করার জন্য সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি সালিম হাতুমকে চেন?" এলি কোহেন এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে সরাসরি সালিম হাতুমের দিকে তাকিয়ে বললেন, "না, আমি তাকে চিনি না।"

এ অংশটা টিভিতে দেখানো হয়। ফরাসি ল'ইয়ার বলেছিলেন, দামেস্কের সবাই হাসছিল এ অংশটা দেখে। কিন্তু একবারও বলা হয়নি কী কী তথ্য এলি ইসরাইলকে পাচার করেছেন।

মোসাদের দেয়া টিভিতে প্রতিদিন এলির পরিবার দেখতে ল্যাগলো ট্রায়ালের অংশবিশেষ আর খবরাখবর। সোফি একবার বলে উঠলো, "এই তো আমার বাবা, আমার হিরো!"

নাদিয়া কেবল কেঁদেই গেলেন। তিনি তো নিশ্চিতভাবে জানতেন না কখনই যে তার স্বামী একজন স্পাই, তবে হালকা আন্দাজ তিনি করতে পেরেছিলেন যে কোথাও কিছু একটা মিলছে না।

মার্চ ৩১ তারিখে কোর্ট আদেশ দিলেন, এলি কোহেন, মজিদ শেখ আল-আর্দ এবং লেফটেন্যান্ট জাহির আল-দ্বীনকে ফাঁসি দেয়া হবে।

মার্সিয়া চেষ্টা করলেন ইসরাইল থেকে বড় অংকের সাহায্যের বিনিময়ে যেন কোহেনকে ছেড়ে দেয়া হয়। অনেক ওষুধপত্র, কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি, মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের জিনিস ইসরাইল দেবে। তাও যেন এলি কোহেনকে ছেড়ে দেয়া হয়। ইসরাইলও ১১ সিরীয় স্পাইকে ছেড়ে দেবে।

কিন্তু সিরিয়া কানেই তুলল না এ প্রস্তাব। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক এলি কোহেনের ফাঁসির ব্যাপারে অটল রইলো সিরিয়া সরকার। রাষ্ট্রীয় ক্ষমার প্রশ্নই আসে না।

তবে মজিদ শেখের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন করা হল। ওদিকে, নাদিয়া প্যারিসের সিরীয় দূতাবাসে ক্ষমার আবেদন করলেন। সারা বিশ্ব থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোক ক্ষমার জন্য অনুরোধ করলেন। যেমন, স্বয়ং পোপ, ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল, বেলজিয়ামের রানি, রেড ক্রস, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ২২ সদস্য, ফ্রান্স, কানাডা আর মানবাধিকার সংস্থাগুলো। মোসাদের প্রধান সোভিয়েতের সাহায্য পর্যন্ত চেয়েছিলেন।

কিন্তু, সিরিয়া সরকার অটল রইলো।

ফাঁসি হবেই এলি কোহেনের।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৯৬৫ সালের মে মাসের ১৮ তারিখ। মধ্যরাতে জেলখানার লোক এলি কোহেনকে জাগালো। তারা তাকে লম্বা সাদা গাউন পরালো, এরপর দামেস্কের মার্জেহ স্কয়ার বাজারে নিয়ে গেল। সেখানে তাকে একটি চিঠি লেখার অনুমতি দেয়া হলো। দামেস্কের একজন র‍্যাবাইয়ের সাথে কথা বলতেও দেয়া হয়েছিল। সেই র‍্যাবাইয়ের নাম নিসিম আন্দাবো।

এলি কোহেনের শরীরে আরবিতে লেখা বড় পোস্টার এঁটে দেয়া হলো, সেখানে তার শাস্তির রায় লেখা। টিভি ক্যামেরা আর পত্রিকার ক্যামেরা এলি কোহেনের ওপর ধরা হলো, দুপাশে দুই সারি সেনা। কোহেন ফাঁসির পাটাতনে উঠে গেলেন।

এলির গলায় ফাঁস পরানো হলো। টুলে দাঁড়া করানো হলো তাকে। দর্শকদের দিকে ফেরা এলি কোহেন।

টুল সরিয়ে দেয়ার পর দর্শকেরা খুশিতে চিৎকার করে উঠলো। সিরিয়ার শত্রু বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর এলি কোহেনকে পরপারে পাঠানো হয়েছে।

পরের ছয় ঘণ্টা তার মৃতদেহ সবার দর্শনের জন্য রেখে দেয়া হয় সেখানে।

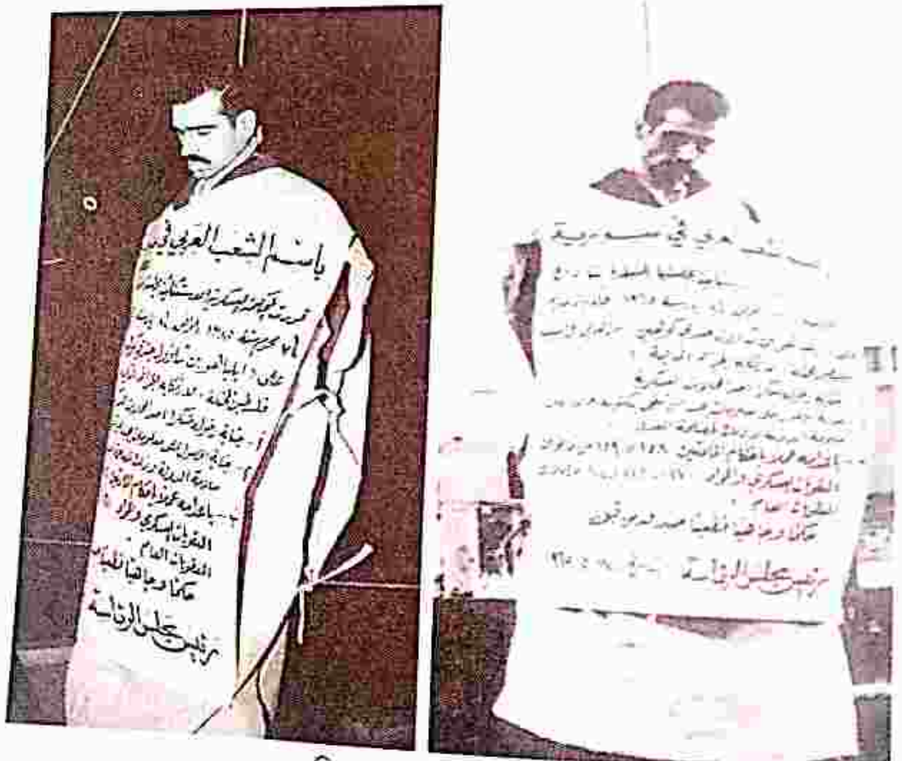

এলি কোহেনের ঝুলন্ত লাশ

ওদিকে ইসরাইলে জাতীয় বীরে পরিণত হলেন এলি কোহেন। তার নামে স্কুল-কলেজ-পার্ক বানানো হলো।

নাদিয়া আর কোনোদিন বিয়ে করেননি।

আজও সিরিয়া এলি কোহেনের দেহাবশেষ ফিরিয়ে দেয়নি ইসরাইলকে।

এলি চাননি ফিরে যেতে, কিন্তু মোসাদই জোর করেছিল তাকে ফিরে গিয়ে ট্রান্সমিশন অব্যাহত রাখতে। বলেছিল পার্লামেন্টের বিতর্কের মতো অর্থহীন জিনিসও ট্রান্সমিট করতে।

এলিকে মোসাদের হিরো ধরা হলেও, তার মৃত্যুর জন্য দায়ী মোসাদই।

এলি কোহেনের গল্প নিয়ে চিত্রায়ণও হয়েছে একাধিকবার। এর মাঝে নেটফ্লিক্সের 'দ্য স্পাই' (২০১৯) বেশ সাড়া জাগায়। তবে নাদিয়া কোহেন জানান এ সিরিজের কিছু অংশ দেখে তার প্রেশার বেড়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে নাদিয়ার ইসরাইলে এলি-বিহীন থাকা অবস্থায় যা যা দেখানো হয়েছে সেগুলো দেখে। সেগুলোর পুরোটাই কাল্পনিক বলে মন্তব্য করেন তিনি।

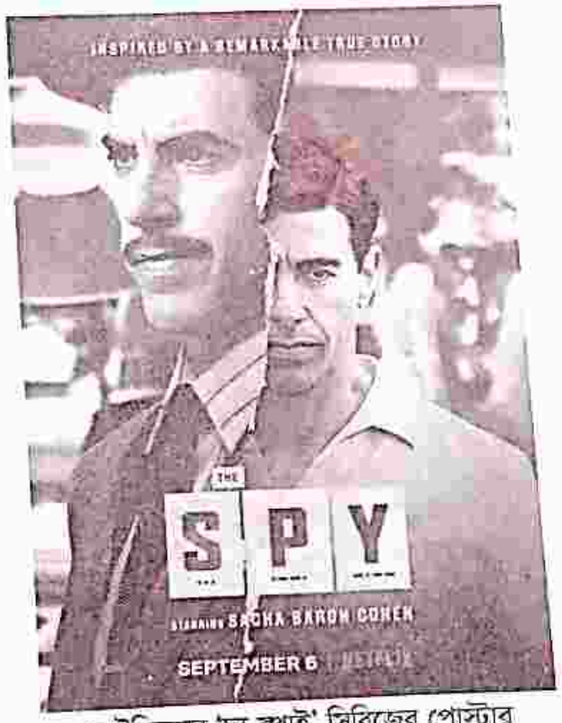

নেটফ্লিক্সের 'দ্য স্পাই' সিরিজের পোস্টার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোহেনের দেহাবশেষ ফিরিয়ে আনার ক্যাম্পেইন এখনও চালানো হয়। স্ত্রী নাদিয়া কোহেন স্বামীর কৃতকার্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন জেনারেল হাফিজকে, যেন তিনি দেহাবশেষ ফিরিয়ে দেন।

সিরিয়া অটল থাকে।

২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তুর্কি সরকার চেষ্টা করেছিল মধ্যস্থতা করতে এ ব্যাপারে।

তবুও সিরিয়া অটল থাকে।

নাদিয়া কোহেন এলির সাথে তার ছবিগুলো দেখাচ্ছেন

শোনা যায়, সিরিয়া তিনবার দাফন করেছে এলি কোহেনের দেহাবশেষ, যেন মোসাদ বিশেষ অভিযান চালিয়ে তা উদ্ধার করে নিয়ে যেতে না পারে। ২০১৯ সালে গুজব রটে রাশিয়ান ফোর্স নাকি এলি কোহেনের দেহাবশেষ উদ্ধার করে এনেছে, তবে রাশিয়া এ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানায়, এবং এটিকে ভুয়া খবর বলে দাবী করে।

২০১৬ সালে একটি সিরীয় গ্রুপ মৃত্যুদণ্ডের পর কোহেনের লাশের ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করেছিল। এর আগ পর্যন্ত ধরা হতো, কোনো ভিডিও ছিল না সে মুহূর্তের, যদিও ক্যামেরা ছিল সেখানে। সেই ভিডিওতে ফাঁসি পরবর্তী তার বুলন্ত লাশ থেকে শুরু করে কফিনে ভরা পর্যন্ত দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

এলি কোহেনকে কফিনে রাখবার দৃশ্য,

ভিডিও- https://www.youtube.com/watch?v=4VzmFPT3IfA

কোহেনের হাতঘড়িটি সিরিয়ায় সেকেন্ড হ্যান্ড বিক্রি হচ্ছিল, মোসাদ সেটা কিনে নেয় ২০১৮ সালের ৫ জুলাই এবং বিশেষ অপারেশনের মাধ্যমে ইসরাইলে নিয়ে আসে। মোসাদের বর্তমান প্রধান সেটি কোহেন পরিবারের হাতে তুলে দেয়। বর্তমানে সেই ঘড়ি মোসাদের হেডকোয়ার্টারে শোভা পাচ্ছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দামেস্কের এ ছবিতে কোহেনের হাতে সেই ঘড়ি দেখা যাচ্ছে

এলি কোহেনের সেই ঘড়ি

পরিশিষ্ট

এলি কোহেনের ঘটনা ইসরাইলের দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের একটি ব্যর্থতাই বলা চলে। সিরিয়ার অনেক তথ্যই মোসাদ এলি কোহেনের বরাতে পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই এলি কোহেনকেই ক্ষমা না করে মোসাদকে চরমতমভাবে অপমান করার সুযোগ হাতছাড়া করেনি সিরিয়া। এখনও অটল আছে তাতে সিরিয়া।

তবে তার মানে এই নয় যে, মোসাদের অপারেশনগুলো এরকমভাবে ব্যর্থ হয়। বরং তাদের বেশিরভাগ অভিযানই ভয়ংকরভাবে সফল। সেটা মুসলিম বা অমুসলিম যে দেশেই হোক না কেন।

ইসরাইলের স্বার্থের সাথে জড়িত যেকোনো কিছুর জন্য মোসাদ নিবেদিতভাবে লড়াই করে। যেমন, ইহুদীদের হলোকস্টের অন্যতম হোতা আইখম্যানকে আর্জেন্টিনা থেকে ধরে এনে জেরুজালেমে যুদ্ধাপরাধের বিচার করার দৃষ্টান্ত তাদের সফলতম মিশনগুলোর একটি।

কিংবা মিউনিখ অলিম্পিকে যে ১১ জন ইসরাইলি অ্যাথলেটকে হত্যা করা হয়েছিল, সেটির প্রতিশোধ স্বরূপ লঞ্চ করা অপারেশন 'র‍্যাথ অফ গড' চলে বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। সেটির বর্ণনাও বেশ লোমহর্ষক।

২০১৮ সালে কুয়ালালামপুরে হামাস ইঞ্জিনিয়ার ফাদি মুহাম্মাদকে হত্যা করা, ২০১৮ সালে ইরানি নিউক্লিয়ার আর্কাইভ চুরি করে আনা, মাসায়েফে ২০১৮ সালে সিরীয় বিজ্ঞানী আজিজ আসবারকে হত্যা করা, ২০১৯-এ লেবাননে দুই হিজবুল্লাহ যোদ্ধাকে হত্যা করা ইত্যাদি মিশন প্রমাণ করে মোসাদ থেমে নেই, প্রতিনিয়তই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইলের স্বার্থে।

এই যেমন এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি যখন জমা দিচ্ছি, তখনও খবর ঘোরাফেরা করছে, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে মোসাদের নতুন প্রধানকে বাছাই করে ফেলেছেন। কিন্তু বিদায়ী ডিরেক্টর ইয়োসি কোহেনের মতো তার নাম-পরিচয় এত ফলাওভাবে আনা হচ্ছে না। তাকে 'ডি' (D) নামে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। কেবল জানানো হয়েছে, মোসাদের প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর, এ পদে ছিলেন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুবছর। তিনি ইসরাইল ডিফেন্স ফোর্সেও কাজ করেছেন, আবার মোসাদের হয়ে নানা অভিযানেও অংশ নিয়েছেন।

সে যাই হোক, এ বই যদি ভালো লেগে থাকে, তবে ভবিষ্যতে মোসাদের আরও নানা নাটকীয় মিশন নিয়ে বই করার ইচ্ছে আছে। শুধু মোসাদ কেন, বিশ্বের আরও নানা গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষ মিশনগুলো নিয়েই বই লিখতে আগ্রহী আমি। সংস্থা প্রতিষ্ঠার আগে কেমন ছিল, কেন প্রতিষ্ঠা হলো, এক নজরে সে সংস্থা, আর গুরুত্বপূর্ণ কিছু মিশন—এ ফরম্যাটেই হয়তো লিখব সময়-সুযোগ আর পাঠকের সাড়া পেলে।

এ বই নিয়ে কারও প্রশ্ন থাকলে, ভুল সংশোধন কিংবা এ বই ও পরবর্তী বই নিয়ে পরামর্শ দিতে চাইলে, নিচের ঠিকানায় আমাকে মেইল করতে অনুরোধ করছি—

abdullah30im@gmail.com কিংবা abdullah.ibn.mahmud@roar.global

কিংবা আমাকে আমার ফেসবুক প্রোফাইলে খুঁজে পেতে পারেন এবং মেসেজ করতে পারেন:

Abdullah Ibn Mahmud: https://www.facebook.com/abdullah.ibnmahmud/

ছোটখাট এ বইটি কিছুটা হলেও জানার খোরাক যদি মিটিয়ে থাকতে পারে, তাহলেই আমার লেখা সার্থক।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ

ঢাকা

মার্চ ২০২১

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিশ্বের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা ইসরাইলের 'মোসাদ'।
বিশ্বের নানা দেশে ছড়িয়ে আছে তাদের সিক্রেট এজেন্টরা। কিন্তু
আপনি জানেন কি, মোসাদের হেডকোয়ার্টার কোথায়?
কেউ জানে না। অন্তত কাগজে কলমে মোসাদের সাথে সংশ্লিষ্টরা
... কেউই বলতে পারে না নিশ্চিতভাবে যে,
এটাই মোসাদের সদর দপ্তর।

কেন এ রহস্যের আবরণ? কেন এ নির্দয় মায়াজাল?

মোসাদের জন্ম কেন? কীভাবে?
কেমন তাদের হেডকোয়ার্টার?
আর কীভাবেই বা তারা অপারেট করে থাকে?

এসবের পাশাপাশি যুগে যুগে মোসাদের হাতে গোনা কিছু ...
মিশন স্থান পেয়েছে এ বইটিতে।
এক বসাতেই জেনে নিতে পারেন মোসাদের ভয়ংকর দুনিয়া।

তবে আর দেরি কেন!

Rokomari.com
সিক্রেট মিশনস:
মোসাদ স্টোরিজ
আব্দুল্লাহ ...
210828#
213988#...929
30

...ook.com/anyadhara অন্যধারা

ISBN 978-984-95594-5-0